নৈতিক বাধ্যতার তত্ত্বরূপে উপযোগবাদ: সমকালীন ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দীপায়ন পট্টনায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

নৈতিক বাধ্যতার তত্ত্বরূপে উপযোগবাদ : সমকালীন ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Dipayan Pattanayak, Professor, Department of Philosophy, Jadavpur University. And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor:

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Date: 24.01.24

Candidate: Aniruddha Chakraborty

Date: 24.01.2024

প্রস্তাবনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল এম. ফিল. ডিগ্রি সূত্রে। এম. ফিল. গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় ছিল 'Skepticism and It's Value'। ভাবনা ছিল পরবর্তীকালে সংশয়বাদের উপর গবেষণা করার। এই ভাবনার পরিবর্তন ঘটলো রবীন্দ্রনাথের *The Religion of Man* পাঠ করতে গিয়ে। 'Man's Universe' গ্রন্থটির এই প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা গভীরভাবে প্রভাবিত করে এই অনুসন্ধিৎসু মনকে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কী জড়, কী জীব, সব কুলেই সহায়তা ও সমন্বয়ের এক অদ্ভুত পরম্পরা রয়েছে। একটি নিরেট কয়লাখণ্ডকে বিশ্লেষণ করলে যে সকল কার্বণকণা পাওয়া যায়, তাদের গঠনগত উপাদান হিসাবে থাকে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউটন ইত্যাদি। বিপরীতধর্মী হয়েও এক অটুট বন্ধনে আবদ্ধ এরা। যে বন্ধনের ফলশ্রুতি ওই কয়লা খণ্ডটি। ওই বন্ধন যে জীবকুলেও অব্যহত তা দৃষ্টি এড়ায়নি রবীন্দ্রনাথের। তিনি দেখেছেন, যে অসংখ্য কোষ দিয়ে একটি প্রাণী দেহ গঠিত হয় তাদের মধ্যে ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র থাকলেও এক অদ্ভুত নিয়মে তারা একে অন্যের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে। যার আয়ু মাত্র কয়েকটা বছর সেই কোষই দীর্ঘায়ু দেহের স্বার্থে বিনাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে চলে। তখনই মনে প্রশ্ন দেখা দিল, যে নিয়ম জড় ও জীবকুলে বহমান রয়েছে, মানবকুলেই বা তার বিচ্যুতি ঘটবে কেন? সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির আত্মত্যাগ যদি সৃষ্টির নিয়ম হয়, তাহলে সামাজের স্বার্থে ব্যক্তি মানুষই বা সেই ত্যাগে এত পরাম্মুখ হবে কেন? অশিক্ষিত, অপাপবিদ্ধ শিশুর মধ্যে যে প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট, সেই পরার্থবোধ যুক্তিবাদী তথাকথিত শিক্ষিত মনকে ততোখানি স্পর্শ করে না কেন?

এর কারণ কী এই যে, স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রমণের অনুকুলে সে কোনো সুযুক্তি পান না? নীতিদর্শনে তেমন যুক্তি কি নেই? এই যুক্তির সন্ধান করতে গিয়ে মিল-বেন্থামের ইউটিলিটিতত্ত্বের উপর নজর পড়ল, যেখানে সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণের সপক্ষে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। শুধু পাশ্চাত্ত্য নয়, প্রাচ্যেও তত্ত্বটির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। তা সত্ত্বেও সমকালীন ভারতীয় দার্শনিক মনে এই তত্ত্ব দাগ কাটতে ব্যর্থ। ঠিক কী কারণে দৈনন্দিন জীবনে বহুল অনুসৃত এমন একটি তত্ত্ব আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকদের না-পসন্দ হয়ে উঠেছে? তা সন্ধান গিয়ে আলোচ্য গবেষণা কর্মটির অবতারণা।

একটি গবেষণাপত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি গবেষকের একক কৃতিত্ব নয়। বহু মানুষের আশীর্বাদ, অকৃত্রিম ভালোবাসা, প্রযত্ন এবং সহযোগিতার সার্থক রূপায়ন হল এই গবেষণা সন্দর্ভ। প্রথমেই আমি বিনম্র শ্রদ্ধা ও সহস্র কোটি প্রণাম জানাই আমার পরম পূজনীয় আরাধ্য দেবতাকে। যাঁর অসীম কৃপা ও করুণা ছাড়া আমার মতো অতি সাধারণ এক ছাত্রের পক্ষে এই গবেষণাপত্র লেখা সম্ভব হত না। এই গবেষণাপত্র রচনার দীর্ঘ যাত্রাপথে যার নিরন্তর সান্নিধ্য, সাহচর্য, মূল্যবান পরামর্শ, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা আমার পাথেয় হয়েছে তিনি হলেন এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দীপায়ন পট্টনায়ক মহাশয়। তিনি শুধু তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেই নন বরং জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে সুপরামর্শ দিয়ে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন। তাঁর প্রেরণাশক্তির জোরেই নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে বারবার নব নব উদ্যোগে গবেষণাকর্মে মনোনিবেশ করেছি। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ওঁকে পাওয়া আমার কাছে এক অতিরিক্ত পাওনা। ওঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর সব শব্দই অপ্রতুল। তাঁর

প্রতি রইল আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আভূমি প্রণাম। প্রতিটি শিশুর প্রথম শিক্ষক হল তার মা। মায়ের কাছেই আমার শিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি। ওঁর চরণে জানাই আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। আমার স্বর্গীয় পিতা, যিনি আজ জীবিত থাকলে এই গবেষণাকার্য দেখে সব থেকে বেশি আনন্দিত হতেন, তাঁর চরণেও বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ছাত্র হওয়ার সুবাদে যেসকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী স্যানাল, অধ্যাপিকা পিয়ালি পালিত, অধ্যাপিকা মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা মৌসুমী গুহ, অধ্যাপিকা রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা গার্গী গোস্বামী, অধ্যাপক প্রীতম ঘোষাল প্রমুখ। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই। এছাড়াও বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এই দীর্ঘ যাত্রাপথে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের সান্নিধ্য পেয়েছি ও নানাভাবে ঋদ্ধ হয়েছি, তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম জানাই। বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. রজত ভট্টাচার্য মহাশয়কে, যিনি প্রথম আমায় গবেষণা করার স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থগারিক শ্রী বিদ্যুৎ বিহারী সরকার মহাশয় এবং সহায়িকা গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি কাকলি পাল মহাশয়াকে। যাঁরা অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছেন এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করার কাজে। এছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মীকে ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণাকার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন মতো নিয়মানুযায়ী ছুটি মঞ্জুর করে আমায় বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন চুনারাম গোবিন্দ মেমোরিয়াল গর্ভমেন্ট কলেজ, মানবাজার-২, পুরুলিয়ার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ড. অভিজিৎ সরকার মহাশয়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার সহধর্মিণী, ভাই, বোন ও নিকট আত্মীয় পরিজন, যারা নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল করেছে এবং লক্ষ্য পূরণে আমায় বদ্ধপরিকর করেছে তাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। এদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে, যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সকল ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু, প্রয়োজনে যারা তাদের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে, তাদের কথা না বললে এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও আমি সর্বোতভাবে যাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ তারা দয়াময় মাজি, বুদ্ধদেব চ্যাটার্জি, ভূতনাথ জানা, অসীম মাজি, প্রসেনজিৎ বেরা, উদয় কুমার মণ্ডল, সৌমিক সাহা, ভাস্কর পাল, রাহুল কুণ্ডু, সৌরভ সরখেল, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, চিত্তদীপ চ্যাটার্জী, শংকর মালিক, নীতিশ ঘোষ, সুভাষ গুঁই, রাহুল মল্ল, সুরজ হাজারী এবং অরিন্দম মুখোপাধ্যায়।

বিনীত

তারিখঃ ২৪/০১/২০২৪ অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

দর্শন ভবন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৭০০০৩২

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-১১
প্রথম অধ্যায়	১২-৩৯
নীতিবিদ্যা ও নৈতিক বাধ্যতার প্রশ্ন	
১.১ নীতিশাস্ত্রের পটভূমি	
১.২ পরার্থবোধের উৎস সন্ধান: কিছু প্রচলিত ব্যাখ্যা	
১.২.১ পরার্থ ভাবনার ধর্মীয় ব্যাখ্যা	
১.২.২ বাধ্যতাবোধ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা	
১.২.৩ আত্মসিদ্ধির উপায় হিসাবে পরার্থচিন্তা	
১.২.৪ পরার্থ ভাবনায় প্রশংসা ও নিন্দার ভূমিকা	
১.২.৫ বিবেকের নির্দেশ ও পরহিত ভাবনা	
১.২.৬ পরার্থপরতার কারণরূপে মানুষের প্রকৃতি	
১.৩ পাশ্চাত্ত্য নীতিতত্ত্বে নৈতিক বাধ্যতা	
১.৩.১ সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্ব ও কর্তব্যবোধ	
১.৩.২ বাধ্যতাবোধ প্রসঙ্গে সুখবাদী ব্যাখ্যা	
১.৩.৩ কান্টীয় কর্তব্যবাদ ও নৈতিক বাধ্যতার বিচারবাদী ব্যাখ্যা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৪০-৫৬
নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় মিল-বেন্থামীয় উপযোগবাদ	
২.১ উপযোগবাদের পটভূমি	
২.২ উপযোগবাদের পরিচয়	
২.৩ উপযোগবাদের নানা প্রকার	
২.৪ জেরেমি বেন্থাম ও নৈতিক বাধ্যতার উপযোগবাদী ব্যাখ্যা	
২.৫ নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় জন স্টুয়ার্ট মিল	

তৃতীয় অধ্যায় ৫৭-৭৪

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গ মানসে উপযোগবাদের প্রভাব

৩.১ বঙ্গসমাজ ও উপযোগবাদী ভাবনার পটভূমি

৩.২ রাজা রামমোহন ও উপযোগবাদী চিন্তার সূত্রপাত

৩.৩ অক্ষয় কুমারের চিন্তায় উপযোগবাদী ঝোঁক

৩.৪ ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মকাণ্ডে উপযোগবাদের প্রভাব

৩.৫ ইউটিলিটির প্রসারে কেশবচন্দ্র এবং ডিরোজিও

৩.৬ বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম ও ইউটিলিটির বাস্তব রূপায়ন

চতুর্থ অধ্যায় ৭৫-১৪৫

সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে উপযোগবাদের ব্যর্থতা

৪.১ উপযোগ নীতিতে ভারতীয়দের মোহভঙ্গ

৪.২ ‘উদর দর্শন’-এর ব্যর্থতা প্রদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র

৪.৩ উপযোগবাদী সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র মানসে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

৪.৪ প্রয়োজনবাদী নৈতিকতার বিরোধিতায় স্বামী বিবেকানন্দ

৪.৫ ইউটিলিটিতত্ত্বের দুর্বলতা প্রদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৪.৬ সর্বাধিকের কল্যাণ প্রসঙ্গে সর্বোদয়বাদী গান্ধীজী

৪.৭ নৈতিকতার সংখ্যায়নের প্রসঙ্গ এবং শ্রীঅরবিন্দের কঠোর প্রতিক্রিয়া

পঞ্চম অধ্যায় ১৪৬-১৭৮

ভারতীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক বাধ্যতার ধ্রুপদী ব্যাখ্যা

৫.১ পরার্থ প্রবৃত্তি ও ভারতীয় ঐতিহ্য

৫.১.১ শাস্ত্রীয় প্রবচনে পরার্থ প্রবৃত্তি

৫.১.২ পরকল্যাণের আহ্বানে বৃহদারণ্যক উপনিষদ

৫.১.৩ ঈশোপনিষদ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের আদর্শ

৫.১.৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও নিষ্কামকর্মের আদর্শ
৫.১.৫ পরার্থ কল্যাণের মহাজন অনুসৃত পথ
৫.১.৬ বিবেকের কণ্ঠস্বর ও বাধ্যতাবোধ
৫.১.৭ বাধ্যতাবোধের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা
৫.১.৮ নাস্তিক প্রস্থানে পরার্থবোধ
৫.২ প্রসঙ্গ নৈতিক কর্মের স্বাধীনতা : কিছু আপত্তি
৫.৩ নৈতিক কর্মের সম্ভাবনায় আপত্তির নিরাস

উপসংহার ১৭৯-১৯২

গ্রন্থপঞ্জি ১৯৩-২০২

ভূমিকা

ভূমিকা

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতিয়ার হয়েছে তার বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে মানুষ যে বিশ্বকে শুধু হাতের মুঠোয় করেছে তা নয়, আবিষ্কারের পর আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলেছে। এই গ্রহের একছত্র অধিপতি হিসাবে মানুষ তার অস্তিত্ব জাহির করেছে। শুধু এই গ্রহ কেন পৃথিবীর জল, স্থল, অন্তরীক্ষকে অতিক্রম করে গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার কাজও সে অনেকটাই সেরে ফেলেছে। অথচ তার সমস্ত যথেচ্ছ কর্মের মধ্যেও যেন রয়েছে এক অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ। তার সমস্ত মানবিক কর্মকাণ্ড এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা রয়েছে। প্রশ্ন হল এই নিয়ন্ত্রণের শুরু কোথা থেকে? জড়জগৎ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ যেমন কিছু প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তেমনই পশুসমাজ থেকে মানবসমাজের স্থায়িত্ব কিছু সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে। পশুকুলে ওই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের পুরোটাই নির্ধারিত হয় বিবর্তনের ধারায়। দৈহিক প্রবণতা, ক্ষমতা এবং পরিবেশের প্রভাব পশুরাজ্যে আচরণসীমা নির্ধারণ করে। কোন প্রাণী কী পরিমাণে কী কাজ সম্পাদন করবে, এবং কখনই বা তা থেকে বিরত হবে, তা এভাবেই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু মানবজীবনের সবটুকু এভাবে পরিবেশগত শর্ত বা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না। প্রাণী হিসাবে মানব আচরণও যে জৈবিক নিয়মের দ্বারা অনেকখানি নিয়মিত, তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মানবীয় প্রবৃত্তি কিছুক্ষেত্রে যেমন অহৈতুকী, তেমনই বহুক্ষেত্রে তা স্বেচ্ছাচারী। এই স্বেচ্ছাচারিতায় লাগাম টানে কে? যদি প্রত্যেক মানুষ তার নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার দ্বারা পরিচালিত হত, তা হলে সমাজ রণক্ষেত্রে পরিণত হত।

মানব অস্তিত্বই হত বিপন্ন। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ ও ঔচিত্য বোধের অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ তাকে স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বহুলাংশেই নিবৃত্ত করে বলেই মনুষ্য সমাজ এখনও টিকে রয়েছে।

সামাজিক জীবনে তার এই নৈতিক চেতনার গুরুত্ব যে অনেকখানি, তা অস্বীকার করা চলে না। প্রশ্ন হল সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ মানুষের প্রতি যে নৈতিক আচরণ করে থাকে, বা যে আচরণ অন্যের কাছে প্রত্যাশা করে, তা কোন নৈতিক আদর্শের পরাকাষ্ঠায় বিধিবদ্ধ? দেশ, কাল ও সম্প্রদায় ভেদে নৈতিক আদর্শের যে পরিবর্তন হয়, তা বিচারে রাখলেও এক সর্বজনীন অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধ যে সব সমাজেই থাকে, তা অস্বীকার করা চলে না। ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক কারণে ওই মূল্যবোধ কোথাও উচ্চ, কোথাও সাধারণ। আজকের পরিশীলিত মনের বিচারে আদিম সামাজিক নিয়মসমূহের অনেকগুলিই হয়তো নৈতিক বলে গণ্য হবে না। তা সত্ত্বেও দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, পরার্থে আত্মত্যাগ কিছুমাত্রায় সব সমাজেই রয়েছে। এই যে নৈতিক বাধ্যতা বা দায়বদ্ধতা এর উৎস কী? এই নৈতিকতা বোধের জন্ম হয় কোন পরিস্থিতিতে? কীভাবে মানুষ নৈতিক মূল্যের ধারণা গড়ে তোলে? কেনই বা মানুষ তার অন্তরে নৈতিকতাকে গ্রহণ করে, বা লালন করে?

নানা পরিবর্তন ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মানুষ যে নৈতিকতাবোধ ও নৈতিক পরম্পরার উত্তরাধিকারী হয়েছে, তাকে একটি সুসংগঠিত সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার উপযোগী করে গড়ে তুলতে গিয়ে শাস্ত্র হিসাবে "নীতিবিদ্যা"-র জন্ম। সেই লক্ষ্যেই নীতিদার্শনিকেরা নানা প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন। যেমন কোন নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করে পথ চলা মানুষের কর্তব্য, তার কাজের ভালো-মন্দ বিচারের মানদণ্ড কী হবে, তার নৈতিক

কাজকর্মের পরিধি কতদূর বিস্তৃত হবে, তা কি মানব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, নাকি না-মানুষী জগতও তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কী মানুষ, কী না-মানুষ, নিজের সীমা ছাড়িয়ে অন্যের ভাবনায় মানুষ ভাবিত হয় কেন? তার মধ্যে যে পরার্থবোধের পরিচয় প্রায়ই আমরা পাই, তার প্রণোদন কী?

এই প্রশ্নগুলি মূলত পাশ্চাত্ত্য নীতিতত্ত্বের আঙ্গিকেই উত্থাপিত হয়ে থাকে। কিন্তু এগুলি সাধারণভাবে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য নির্বিশেষে সকল দর্শনের, সকল দার্শনিকের প্রশ্ন। ভারতীয় দর্শনেও প্রশ্নগুলির আলোচনা হয়েছে। তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যেভাবে "নীতিশাস্ত্র বা Ethics" দর্শনের একটি শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভারতীয় পরম্পরায় নৈতিক প্রশ্নগুলির আলোচনা সেরকম স্বতন্ত্র কোনো শাখার অধীনে হয়নি। ভারতবর্ষে দর্শন হল একধরনের জীবন জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার অধীনে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, প্রমাণ জিজ্ঞাসা ইত্যাদি যেমন আসে, তেমনি ধর্ম জিজ্ঞাসাও আসে। ওই ধর্ম জিজ্ঞাসা পৃথকভাবে গুরুত্ব পায় ধর্মশাস্ত্রে। এখানে ধর্ম ও নীতি প্রায় সমার্থক শব্দ। তাই ধর্ম জিজ্ঞাসার পরিসরে, নৈতিক প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে ভারতীয় দর্শনে। ধর্ম কী, কীসে ধর্ম রক্ষা হয়, সন্ন্যাসী ও গৃহীর ধর্ম থেকে রাজধর্ম— কার ধর্ম কী হবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা যেমন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিশদভাবে করা হয়েছে, তেমনি মানুষ কেন ধর্মের জীবনযাপন করবে, লোকহিত বা লোকসংগ্রহের আদর্শকে কেন মান্যতা দেবে— সেইসব প্রশ্নেরও উত্তর সন্ধান করা হয়েছে। এই উত্তরগুলি সর্বত্র এক নয়। সম্প্রদায় ভেদে উত্তরের ভেদ লক্ষ্য করা যায়। নৈতিকতার প্রণোদন কী হবে তা নির্দেশ করতে গিয়ে, আস্তিকরা যেপথে হেঁটেছেন, নাস্তিকরা সেপথে হাঁটেননি। এমনকি আস্তিক প্রস্থান ও নাস্তিক প্রস্থানের অন্দরে-

কন্দরে এইসব প্রশ্নের উত্তরেও মতপার্থক্য বিস্তর। প্রস্থান ভেদে উত্তরভেদ বা ব্যাখ্যাভেদ যেমন প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলিতে দৃষ্ট হয়, তেমনি সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যেও এব্যাপারে মতানৈক্যই লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রাচীন থেকে আধুনিক প্রায় সব ভারতীয় দার্শনিক ও সম্প্রদায় লোকহিতের বা হিতবাদের আদর্শকে মান্যতা দিয়েছেন। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং..."[১]— একথা যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, সর্বভূতের হিতে রত থাকার আহ্বান রাখা হয়েছে শ্রীমদ্ভগবতগীতায়, তেমনি "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়"[২]— এই আদর্শ গৃহীত হয়েছে নাস্তিক বৌদ্ধদর্শনে।

পরার্থ প্রবৃত্তিকে নৈতিক কর্ম বলে মান্যতা দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও। স্থূল সুখবাদী ছাড়া পাশ্চাত্ত্য প্রায় সকল নৈতিক মতবাদই পরহিতে কর্মকে নৈতিক কর্ম বলে অনুমোদন করেন। তবে ঠিক কেন পরহিতে বা পরকল্যাণে নৈতিক কর্তার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, সেই প্রশ্নে পাশ্চাত্ত্য নীতিচিন্তকরা একমত হতে পারেননি। এব্যাপারে কর্তব্যবাদীদের দাবি থেকে উদ্দেশ্যবাদীদের দাবি যেমন আলাদা, তেমনি স্থূল সুখবাদীদের থেকে উপযোগবাদীদের দাবিও আলাদা। উপযোগবাদের যেমন নানারূপ আছে, তেমনি উপযোগের ব্যাখ্যাও সর্বত্র এক নয়। তথাপি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদীদের প্রায় সবাই সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শটিকে অনুমোদন করেন। যা যতবেশি উপযোগী, তা যে ততবেশি গ্রহণযোগ্য— এমন একটা ধারণা সাধারণ্যেও প্রচলিত। লৌকিক ধারণা যখন দার্শনিকতত্ত্বের ছত্রছায়া লাভ করে, তখন সেই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়। পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে। সুখ যে তার ঈপ্সিত সেই সত্যটিকে, মানুষ যেমন লুকোতে

---

[১] ছান্দোগ্য উপনিষদ – ৭/২৩/১।

[২] *মহামানব বুদ্ধ*, অভিজিৎ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭৮।

পারে না, তেমনি স্থূল আত্মসুখের মধ্যে স্বার্থপর জীবনযাপনও সামাজিক জীব হিসাবে তার অনুমোদন পায় না। অন্যের প্রতি কর্তব্যের দায়ও সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সমস্তরকম বাহ্য প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে কর্তব্যের জীবনযাপনের কান্টীয় আদর্শকে মেনে নিতেও সে গররাজি। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার একটা চেষ্টা সে খুঁজে পায় ইউটিলিটিতত্ত্বে।

এখানে বলা দরকার যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি, উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ঢেউ প্রথম ইউরোপে লক্ষ্য করা যায়, যা সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি সবক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে। শিল্পায়নের হাত ধরে নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে ইউটিলিটি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। একদিকে আত্মবাদ ও সুখবাদের সংকীর্ণতা, অন্যদিকে যুক্তিসর্বস্ব কান্টীয় বিচারবাদের কঠোরতা— এই দুয়ের প্রতি মানুষ যখন আস্থা হারাতে বসেছে, তখন ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামাজিকস্বার্থকে যুক্ত করে যে উপযোগবাদের আবির্ভাব ঘটে, তা স্বাভাবিকভাবেই সুশীল সমাজের কাছে আদরণীয় হয়। সমাজরক্ষা ও নৈতিকতা রক্ষার যে প্রণোদন বিচারশীল মানুষের মধ্যে থাকে, তাকে ধর্মের ছত্রছায়া থেকে বের করে এনে যুক্তির উপর দাঁড় করানোর তাগিদও সে অনুভব করে। একারণে যুক্তিবাদী ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ব্যক্তিমানসে উপযোগবাদ বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তত্ত্বহিসাবে উপযোগবাদের জনপ্রিয়তা ইউরোপের সীমা ছাড়িয়ে ছাপ ফেলেছিল সুদূর ভারতবর্ষে। ইংরেজ উপনিবেশ পরাধীন ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দের নানা আদবকায়দা অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে সায় দিতে শুরু করেছিল উপযোগবাদী

নীতিতত্ত্বে। প্রশাসক হিসাবে ভারতবর্ষে জন স্টুয়ার্ট মিলের উপস্থিতি ভারতবর্ষে উপযোগবাদী চিন্তা বিস্তারের পথে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বেশকিছু ভারতীয় মনীষী এই নীতিদর্শনকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইউটিলিটিতত্ত্ব সাধারণভাবে ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার আর একটি কারণও ছিল। হিতবাদের একটি পরম্পরা ভারতভূমিতে প্রচ্ছন্নই ছিল। সেই উর্বরা ভূমিতে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীতত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ সহজেই উন্মেষিত হয়। চিরায়ত ভারতীয় হিতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের মিল ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের এই তত্ত্বটিকে গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু ক্রমশই তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ ভারতীয় হিতবাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উপলব্ধি থেকেই পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ সম্বন্ধে বিরূপতা দেখা দেয় তাদের মধ্যে। বঙ্গমানসে এই প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেলেও, মহাত্মা গান্ধী থেকে রাধাকৃষ্ণণ, অনেক সমকালীন ভারতীয় চিন্তকই এই উপযোগবাদী ভাবধারা সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের অভিমুখ হল উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন ভারতীয় চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন। এই প্রসঙ্গে "সমকালীন-ভারতীয়-দর্শন"-এই শব্দবন্ধটির অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। সমকালীন, আধুনিক, এই শব্দগুলির ব্যবহারে অনেকখানি অনির্দিষ্টতা রয়েছে। 'গতকাল', 'আগামীকাল' এইসকল অভিধাগুলির ব্যঞ্জনা যেমন দিনভেদে বদলে যায়, 'সমকালীন', 'সমসাময়িক', 'আধুনিক' প্রভৃতি বর্ণনাগুলির তাৎপর্যও তেমনই বদলে বদলে যায়। ইংরেজি সাহিত্যে 'প্রাচীনযুগ', 'মধ্যযুগ', 'আধুনিকযুগ', 'উত্তর

আধুনিকযুগ'— এভাবে চিন্তার বহমানতাকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষিতে কালের এই সীমা নির্দিষ্ট করা বড়োই সমস্যার। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সমকালীন দর্শন বলতে বিংশ শতকের দর্শনকে বোঝায়, যা মূলত বিশ্লেষণী (Analytic) এবং মহাদেশীয় (Continental) এই দুটি ধারায় বিভক্ত। কিন্তু ভারতীয় পরম্পরায় সমকাল ততখানি সুনির্দিষ্ট নয়। এর একপ্রান্ত যদি একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হয়, তাহলে শুরুর প্রান্তটি যে কোথায় তা চিহ্নিত করা মুশকিল। বিশেষত পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশ্লেষণী ও মহাদেশীয় ধারার দাপটে বিংশ শতক পূর্ববর্তী পরম্পরা যেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, ভারতবর্ষে কিন্তু তা হয়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সময়কাল থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে চিন্তার যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে, এই একবিংশ শতকে উপনীত হয়েও তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। এই বিচার থেকে এখানে "সমকালীন ভারতীয় দর্শন" বলতে আমরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় দর্শনকেই বুঝব। সময়ের এই পরিসরে যেসব দার্শনিক বা চিন্তকের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তবে উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন সব ভারতীয় চিন্তকের প্রতিক্রিয়া বিচার করে দেখা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। এই বিবেচনা থেকেই উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন কিছু ভারতীয় দার্শনিকের মূল্যায়নকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে, এর সাথে যুক্ত হয়েছে ভূমিকা ও উপসংহার। এই গবেষণা নিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "নীতিবিদ্যা ও নৈতিক বাধ্যতার প্রশ্ন"। এখানে নীতিশাস্ত্রের পটভূমি বিশ্লেষণ করে, কেন মানুষ সমাজের

অন্য মানুষের জন্য কিছু করবে বা ভাববে— সেই প্রশ্নটি তুলে ধরা হয়েছে। আর এই নৈতিক বাধ্যতা বোধের উৎস কী হতে পারে, সে সম্বন্ধে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিগুলির পাশাপাশি পাশ্চাত্ত্য নীতিদর্শন থেকে পাওয়া কিছু সমাধান বা উত্তরও বিচার করে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে যেমন প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সদ্-গুণের নীতিতত্ত্ব স্থান পেয়েছে, তেমনি সুখবাদ, কান্টীয় কর্তব্যবাদ ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য মতবাদগুলিও আলোচিত হয়েছে।

এই গবেষণা যেহেতু পাশ্চাত্ত্য ইউটিলিটি তত্ত্বকে কেন্দ্র করে, তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নৈতিক বাধ্যতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ইউটিলিটি তত্ত্বের সমর্থকরা যা যা বলে থাকেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হল "নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় মিল বেন্থামীয় উপযোগবাদ"। যদিও ইউটিলিটি তত্ত্বের অনেক রূপ বা প্রকার রয়েছে, তবে ভারতীয় মানসে যেহেতু উপযোগবাদের মিল ও বেন্থাম সম্মত আকারটি অধিক প্রভাব ফেলেছিল, এবং পরবর্তীকালে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, তাই এই অধ্যায়ে মূলত জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়র্ট মিলের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত কেন স্বার্থপর মানুষ পরার্থে প্রবৃত্ত হবে সে সম্বন্ধে বেন্থাম ও মিলের যুক্তিগুলির উপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "ঊনবিংশ শতকের বঙ্গমানসে উপযোগবাদের প্রভাব"। সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের উপনিবেশ হলেও সেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। কাজেই কলকাতা তথা বঙ্গ সংস্কৃতিতে ইংরেজি শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকের মধ্যেই ইউটিলিটিতত্ত্ব বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। যার হাত ধরে বঙ্গীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত বলে মনে করা হয় সেই রাজা

রামমোহন রায়, যার চিন্তায় ইউটিলিটি তত্ত্বের সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল। রামমোহনের পরই যে বাঙালি মনীষীর মধ্যে মিল-বেন্থামীয় দর্শনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতায় হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-এর নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামক একটি দল গড়ে উঠেছিল। এই দলের সদস্যরা প্রগতিবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁর দলের প্রতিটি তরুণ সদস্যদের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপযোগবাদের প্রভাব যে বাঙালি মনীষীর রচনায় সর্বাধিক প্রতিফলিত, তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তা ভাবনায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় ফরাসি দার্শনিক কোঁতের দৃষ্টিবাদ, রুশোর সাম্যবাদ, বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ, ডারউইন ও স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রভাব স্পষ্ট। এছাড়াও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙালি মনীষীগণ এই মতবাদের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের রচনা বিশ্লেষণ করে বঙ্গমানসে উপযোগবাদের প্রভাব কতখানি পড়েছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম "সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে উপযোগবাদের ব্যর্থতা"। বঙ্গ তথা ভারতীয় মানসে উপযোগবাদের প্রভাব যেমন পড়েছিল, তেমনি সেই উপযোগবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষীদের মোহভঙ্গও হয়েছিল। যতখানি সাড়া জাগিয়ে প্রতিশ্রুতিমান নীতিতত্ত্ব হিসাবে এর আবির্ভাব ঘটেছিল, পরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় তা ততখানি দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়নি। মিল-বেন্থামীয় এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা আপত্তির অবতারণা করেছেন পরবর্তী নীতিচিন্তকগণ। ভারতীয় মনীষীদের অধিকাংশই এই পাশ্চাত্ত্য

হিতবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র একসময় পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনিও পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, ঋষি অরবিন্দ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কেউই পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। এইসকল সমকালীন ভারতীয় মনীষীগণ পাশ্চাত্ত্য ইউটিলিটি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

নৈতিক বাধ্যতার স্বার্থক ব্যাখ্যা যদি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ দিতে না পারে, বা সেই ব্যাখ্যা যদি সমকালীন ভারতীয় চিন্তকদের মনঃপূত নাহয়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, পরহিতে কর্ম করার যে প্রবণতা সামাজিক মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তার বিকল্প ব্যাখ্যা কী হবে? বিশেষত সর্বাধিকের পরিবর্তে সর্বহিতে কর্ম করার যে আদর্শের কথা তারা বলেন, কর্তার দিক থেকে সেই আদর্শ অনুসরণের প্রণোদন ঠিক কী হবে? নৈতিক বাধ্যতার এই বিকল্প ব্যাখ্যা পেশ না করে, জনপ্রিয় ও বাস্তবোচিত উপযোগবাদীতত্ত্বের অপকর্ষতা দাবি করা সমীচীন বলে মনে হয় না। এই উদ্দেশ্যেই নৈতিক বাধ্যতা বা সর্বহিতে কর্ম করার প্রণোদনের সপক্ষে ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন যেসব যুক্তি পেশ করে, সেগুলি বিচার করে দেখার চেষ্টা হয়েছে এই গবেষণা কর্মের পঞ্চম অধ্যায়ে।

এই গবেষণার অন্তিম অধ্যায় হল উপসংহার। এই অংশে মূলত উপযোগবাদ প্রসঙ্গে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে। উপযোগবাদ শুধু যে দার্শনিক মতবাদ হিসাবেই জোরালো তাই নয়, জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এমনকি রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও এটি বিশেষ উপযোগী। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সকলকে

একসূত্রে গাঁথার প্রয়াসই একে জনপ্রিয় করে তুলেছে। নিজেকে বঞ্চিত না করেও যে অন্যদের হিতসাধন করা যায়, সে পথের সন্ধান দেওয়াতেই মতটির অভিনবত্ব। তাসত্ত্বেও সমকালীন ভারতীয় একদল চিন্তক যখন এই মতবাদ সম্বন্ধে তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করেন, তখন বিচার করে দেখা দরকার যে, তাদের ওই অনাস্থা পোষণের সারবত্তা কতখানি? শুধুমাত্র ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে বেমানান বলে একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করে দেওয়া যায় না। যেসব আপত্তি তারা মিল বেন্থামীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন, ইউটিলিটিতত্ত্বের দিক থেকে সেগুলির কোনো সদুত্তর দেওয়া যায় কি? বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকা থেকে গোটা পৃথিবী ক্রমশ যে ভাবধারা গ্রহণ করছে, যাপিত জীবন যাকে বেশি বেশি করে সমর্থন করছে, নৈতিকতত্ত্ব হিসাবে তাকে ব্যর্থ বলা কতখানি সংগত? অন্যদিকে একথাও ঠিক যে, পরিবর্তন মাত্রই অগ্রগতি নয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ থেকে গান্ধীজীর মতো বিশ্বকল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ মহাত্মারা যখন একটি তত্ত্বকে নৈতিকতার ছাড়পত্র দিতে গড়রাজি হন, তখন ওই তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের আশঙ্কা ও আপত্তির গুরুত্ব খতিয়ে দেখতেই হয়। এই বিচার বিবেচনাই গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণা নিবন্ধের উপসংহারে।

সমগ্র গবেষণাপত্রটি ইউনিকোড কালপুরুষ ১৪ পয়েন্টে মুদ্রিত হয়েছে। বিস্তৃত উদ্ধৃতিগুলি ১২ পয়েন্ট এবং ইনডেন্ট করা হয়েছে, ফলে কোটেশন চিহ্ন বর্জিত হয়েছে। তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ‘দর্শন বীক্ষা’ পত্রিকায় নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

নীতিবিদ্যা ও নৈতিক বাধ্যতার প্রশ্ন

প্রথম অধ্যায়

নীতিবিদ্যা ও নৈতিক বাধ্যতার প্রশ্ন

১.১ নীতিশাস্ত্রের পটভূমি

যে কোনো শাস্ত্র গড়ে ওঠার একটা পটভূমি থাকে। একটি বিশেষ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই একটি বিশেষ শাস্ত্রের উৎপত্তি। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার উৎপত্তি ঘটেছে এভাবেই। বিজ্ঞান মাত্রই চায় পূর্বাভাস এবং সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মানব জীবনকে সহজ ও উপভোগ্য করে তুলতে। কিন্তু এই পূর্বাভাস সফল হতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকে। ওই জ্ঞান তাকে যেমন নিয়ম প্রণয়নের স্বাধীনতা দেয়, তেমনই সেই নিয়মকে হাতিয়ার করে ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে সফল পূর্বাভাস করার অধিকার দেয়। শাস্ত্রটির চর্চা যত ব্যাপক, বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়, সফল পূর্বাভাসের হারও ততই অধিক হয়। বিজ্ঞানের মতো কলা বিভাগের শাখাগুলির উৎপত্তিও প্রয়োজনেই ঘটেছে। তা সে ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞানের মতো তাত্ত্বিক শাস্ত্র হোক কিংবা নন্দনতত্ত্ব, ভাস্কর্য বিদ্যার মতো ব্যবহারিক শাস্ত্র। যদিও প্রয়োজনভিত্তিক শাস্ত্রের তুলনায় অহৈতুকী শাস্ত্র হিসাবেই বিজ্ঞান বা কলাকে দেখতে অ্যারিস্টটলের মতো চিন্তাবিদরা বেশি আগ্রহী ছিলেন। তথাপি বিজ্ঞান ও কলার শাখাগুলির বিকাশে প্রয়োজনের তাগিদ যে রয়েছে, তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।[১]

দর্শন শাস্ত্রের শাখা হিসাবে নীতিবিদ্যার আবির্ভাবও প্রয়োজন নিরপেক্ষ নয়। জ্ঞানের স্বরূপ, উৎস ও সীমা নির্ধারণ করতে গিয়ে যেমন Epistemology বা প্রমাণ শাস্ত্রের উৎপত্তি, বস্তুর স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে যেমন সৃষ্টি Metaphysics বা পরাবিদ্যার তেমনই

[১] "Since there are many kinds of actions and many arts and sciences, it follows that there are many ends also…" —*The Nicomachean Ethics*, Aristotle. p.1.

বচনে, লিখনে ও মননে অকাট্য হওয়ার তাগিদে জন্ম Logic বা তর্কবিদ্যার। দর্শনের শাখা হিসাবে নীতিবিদ্যাও নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে বিকশিত। সত্য ও তত্ত্বের জ্ঞান যেমন মানুষের চির ঈপ্সিত, চিন্তায় শুদ্ধতা বজায় রাখার অন্তরতম তাগিদ যেমন তার রয়েছে, তেমনি সত্য ও তত্ত্ব বিষয়ক শুদ্ধ চিন্তাকে সুন্দর ও মঙ্গলময় কর্মে রূপদান করার একটি সুগভীর প্রণোদনও বর্তমান তার মধ্যে। এই প্রণোদন তাকে চালিত করে এমন একটি শাস্ত্র গঠনে, যা কর্মে পরিণত চিন্তাকে সঠিক অভিমুখ দিতে পারবে। চিন্তার কর্মময় এই রূপকে বলা হয় আচরণ। এই আচরণের শুভাশুভ বিচার করতে না পারলে, শুভত্বের একটি আদর্শকে সামনে রেখে নিজের তথা অন্যের আচরণের মধ্যে কতখনি ন্যায্যতা রয়েছে, সেটুকু বুঝে নিতে না পারলে মানুষ শান্তি পায় না। তাই সে সন্ধান করে এমন একটি শাস্ত্রের যা তার আচরণবিধি ঠিক করে দেবে। একটি ক্রিয়া বা একটি আচরণ নীতিগত ভাবে ঠিক কতখানি ভালো বলে গণ্য হবে, কখনই বা তা অন্যায় হবে? সেই বিচারবুদ্ধি বা ন্যায়-অন্যায় বোধকে একটি দিশা দেওয়ার লক্ষ্যেই শাস্ত্র হিসাবে নীতিবিদ্যার জন্ম।

নীতিবিদ্যা যে মানব আচরণের দিশা দেওয়ার লক্ষ্যেই গড়ে উঠেছে সে বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে দুটি শব্দকে ঘিরে, নীতিশাস্ত্রের চর্চা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাদের উপর আলোকপাত করে। নীতিবিদ্যাকে বোঝাতে পাশ্চাত্যে ‘Ethics’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ‘*Ethos*’ এই গ্রিক শব্দ থেকে ‘Ethics’ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। ‘*Ethos*’ শব্দটির অর্থ হল সামাজিক প্রথা, অভ্যাস বা আচরণ। এই অর্থে ‘Ethics’ বলতে বোঝায় সেই শাস্ত্রকে, যা মানুষের আচরণ এবং চরিত্রের প্রশংসা ও নিন্দার যুক্তিসঙ্গত মান নির্দিষ্ট করে দেয়। অন্যদিকে ‘Ethics’ কে আবার ‘Moral Philosophy’ বা ‘নীতিদর্শন’ নামেও অভিহিত করা হয়। উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা একে দেখেছেন দর্শনের সেই শাখা হিসাবে যা নৈতিকতা,

নৈতিক সমস্যা, নৈতিক অবধারণ ইত্যাদি বিষয়ে দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের কথা বলে।[২] প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ল্যাতিন শব্দ *'Mores'* থেকে 'Moral' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এই শব্দটির অর্থ হল রীতিনীতি বা অভ্যাস। সুতরাং নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের 'রীতিসম্মত আচরণ বা আভ্যাসজাত আচরণ'। পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদ ম্যাকেঞ্জি নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষের চরিত্র বা আচরণের ঔচিত্য বা ভালোত্ব'।[৩] নীতিবিদ্যা বলতে আমরা সাধারণত আচরণ সম্বন্ধীয় আদর্শমূলক বিদ্যাকে বুঝি। পাশ্চাত্ত্য নীতিশাস্ত্রের অন্যতম ভাষ্যকার ইউলিয়াম লিলির মতে, সমাজস্থ ব্যক্তি কীরূপ আচরণ করবে, সমাজ জীবনে কোন কর্মটি ন্যায়সংগত বলে সর্বজন স্বীকৃত হবে, এবং কোন কর্মটি নিন্দনীয় বলে বর্জনীয়— তা আলোচনা করে যে শাস্ত্র, তাকেই আমরা নীতিশাস্ত্র বলে থাকি।[৪] সুতরাং সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদ্যার আলোচনা প্রাসঙ্গিক তাই সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষের আচরণের মঙ্গল-অমঙ্গল, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করাই এই শাস্ত্রের কাজ।

এই সংজ্ঞাগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে সামাজিক মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ সংক্রান্ত আলোচনা নীতিবিদ্যার মুখ্য উপজীব্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা থেকে যায় মানুষের যে, আচরণের নৈতিক বিচারের দায়িত্ব নীতিবিদ্যার উপর ন্যস্ত হচ্ছে, তা কোন ধরণের আচরণ? যেকোনো ধরণের আচরণ যে নীতিবিদ্যার বিচার্য নয়, তা সহজেই অনুমেয়। কারণ শরীরযন্ত্রীয়, অভ্যাসসিদ্ধ, প্রতিবর্তমূলক এমন বহু আচরণ রয়েছে যেগুলি মানুষের

---

[২] "Ethics is a branch of philosophy; it is moral philosophy or philosophical thinking about morality, moral problems and moral judgments." – *Ethics*, William K Frankena, p. 4.

[৩] "Ethics is the science of conduct. It considers the actions of human beings with reference to their rightness or wrongness." – *A Manual of Ethics*, John S. Mackenzie, p.1.

[৪] "We may define Ethics as the normative science of the conduct of human beings living in societies – a science which judges this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way." –*An Introduction to Ethics*, William Lillie, p.1.

ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ওইসব অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার বিচার অর্থহীন। অতএব নীতিবিদ্যা যে মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার যথার্থতা বিচারে প্রয়াসী হবে সেকথা না বললেও চলে। আবার, আচরণ বিষয়ক আলোচনা মনোবিদ্যাও করে থাকে। আধুনিক মনোবিদদের অনেকে যেমন জে বি ওয়াটসন 'আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞান'[৫] হিসাবে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কিন্তু আচরণ নিয়ে ওই শাস্ত্রের আলোচনা হলেও যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনোবিদ আচরণের বিচার করেন তা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি। সেখানে আচরণের আদর্শ গড়ে দেওয়ার বা আচরণের মূল্যায়ন করার কোনো চেষ্টা থাকে না, থাকে ভালো-মন্দ, ঐচ্ছিক-অনৈচ্ছিক সকল আচরণের বিষয়নিষ্ঠ বিবরণ।

প্রশ্ন থেকে যায় মানুষের যে আচরণের নৈতিক মূল্যায়নে নীতিবিদ্যা তৎপর সেই আচরণ কার প্রতি আচরণ? সাবেকি আদর্শনিষ্ঠ নীতিবদ্যায় মূলত মানুষের প্রতি মানুষের আচরণকেই নৈতিক বিচারের গণ্ডির মধ্যে রাখা হয়। কিন্তু সম্প্রতিক কালের নীতিবিদরা মনে করেন শুধু মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের ভালো মন্দের আলোচনায় নীতিবিদ্যা সীমায়িত থাকতে পারে না। তার আলোচনার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক হওয়া দরকার। মানুষের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে মনুষ্যেতর প্রাণী, পশু, পাখি, উদ্ভিদ ইত্যাদি সকল জীবের প্রতি মানুষের আচরণেরও নৈতিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার। কারণ নিজ গোষ্ঠী বা দেশভুক্ত কিংবা দেশ গোষ্ঠী বহির্ভূত সকল মানুষের প্রতি যেমন মানুষের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি মনুষ্য সমাজ বহির্ভূত যে সকল জৈব সত্তা রয়েছে তাদের প্রতিও মানুষের কিছু নৈতিক কর্তব্য রয়েছে। অতএব যে যুক্তিতে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি একজন মানুষের আচরণ উচিত বা অনুচিত বলে বিবেচিত হতে পারে, সেই একই যুক্তিতে পশু, পাখি, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ— সকল জীবের প্রতি তার আচরণও নৈতিক বিচারের বিষয় হতে পারে।

---

[৫] *A Text Book of Psychology* (*Part-I*), P. N. Bhattacharyya, p.15.

নৈতিক আচরণের অভিমুখ যে বিষয়, সেই বিষয় যে শুধুমাত্র জৈব সত্তা হবে, এমন দাবি মানতে নারাজ বেশ কিছু নীতিবিদ। তাঁদের মতে নদীনালা, জলাভূমি, তট থেকে সমুদ্র, পর্বত, মরু, আকাশ, বাতাস— সকলের প্রতি মানুষের আচরণ নৈতিকতা বা নীতিবিদ্যার বিচার্য। যদিও ঠিক কী কারণে না-মানুষী জগতের প্রতি মানুষের আচরণ নৈতিক হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই প্রশ্নে সব নীতিবিদ একমত হতে পারেন না। তাঁদের অধিকাংশ না-মানুষী জগতের কোনো স্বগত মূল্য স্বীকার না করে, কেবল সহায়ক মূল্য স্বীকার করেন। তাদের যুক্তি মানুষের আচরণ যদি নীতি সম্মত না হয়, তা হলে ক্ষতি হয় তার নিজেরই। পশু পাখি ধ্বংস হলে শুধু যে পরিবেশ নষ্ট হয় তা নয়, মানুষের খাদ্য ভাণ্ডারেও টান পরে। অরণ্য বিনষ্ট হলে বাতাসে জীবনদায়ী উপাদানগুলির ভারসাম্য যেমন নষ্ট হবে, তেমনি জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় নানা উপকরণ লাভ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ— মানুষের অন্যায় আচরণে এগুলি যদি দূষিত হয়, তা হলে এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতা সংকটের মুখে পড়বে। আর ঠিক এই কারণেই না-মানুষী জগতের প্রতি মানুষের আচরণ নৈতিক বিচারের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কিছু নীতিবিদ রয়েছেন যারা না-মানুষী জগতের স্বগত মূল্য স্বীকার করেন। তাদের দৃষ্টিতে শুধু মানুষের প্রয়োজনে লাগে বলেই পশু, পাখি, গাছপালা এদের প্রতি মানুষের আচরণ নৈতিক হওয়া কর্তব্য এমন যুক্তি ঠিক নয়। তবে না-মানুষী জগতের স্বগত মূল্য ঠিক কী কারণে থাকা উচিত, সেই প্রশ্নে এই নীতিবিদরা একমত নন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানব আচরণের মূল্যায়নই নীতিবিদ্যার লক্ষ্য, তার সেই আচরণ মানুষের প্রতিই হোক কিংবা না-মানুষী জগতের প্রতি। তবে নিজের বা অন্যের আচরণধারাকে নৈতিক আদর্শের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে না পারলে কর্তব্য অকর্তব্য নির্ধারণ সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় না সমাজ রক্ষা। আর ঠিক এই কারণেই সে ব্রতী হয়

নৈতিক আদর্শের সন্ধানে, নীতিশাস্ত্রের চর্চায়। অবশ্য মানুষের নীতিশাস্ত্র চর্চার অন্য একটি কারণও রয়েছে। যেটি তার সামাজিক ব্যবহারের মূল নিয়ন্ত্রক হবে সেই আদর্শ অভিমুখে নিজের সমগ্র জীবনকে চালিত করার তাগিদও রয়েছে তার। একদিকে সমাজ রক্ষা, অন্যদিকে আদর্শ অভিমুখে আপন জীবনের উত্তরণ ঘটানো— এই দ্বিবিধ প্রণোদন মানুষকে নীতিচর্চার পথে চালিত করেছে। 'আত্মানো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'[৬]— এই বৈদিক উপলব্ধি নীতিশাস্ত্র গড়ে তোলার মূল প্রেরণা।

কিন্তু জগতের হিত চিন্তা মানুষকে ভাবিত করে কেন? আত্মমুক্তি মানুষের স্বাভাবিক ঈপ্সা। মানুষ যেমন জন্মগত ভাবে সুখ পিয়াসী, তেমনি দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি তার স্বাভাবিক বাসনা। আর এই দুঃখ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে গিয়ে সে এক সময় আবিষ্কার করে, যে সুখ তার অভিলষিত তা আসলে দুঃখানুবিদ্ধ। তখন সুখ দুঃখ নির্বিশেষে সবই যে পরিণামে দুঃখের এই উপলব্ধি জাগে তার। উপলব্ধির এই স্তরে সহসা উন্নীত হয় না কেউ। পরতে পরতে খুলে যাওয়ার মতো উপলব্ধির ক্রমে এই চেতনার অধিকারী হতে পারে কেউ কেউ; তবে সেই সংখ্যা কোটিকে গুটিক। চেতনার এই উচ্চতর স্তরে যাদের বিচরণ সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন তাঁরা। এভাবে দুঃখ মুক্তির স্বাভাবিক ইচ্ছা থেকে আত্মমুক্তির মহতী বাসনা উৎসারিত হয়, একথা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু জগতহিত বা সমাজ রক্ষার যে দায় তা জন্ম নেয় কীভাবে? স্বাভাবিক ভাবেই যার লক্ষ্য আত্মসুখ বা আত্মমুক্তি। সেই আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসত্তা ঠিক কোন প্রণোদনে আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে সমাজ রক্ষা ও জগত হিতের ব্রত গ্রহণ করে? একথা ঠিক যে সবার মধ্যে জগত হিতের এই বোধ সমান ভাবে জাগরূক থাকে না। অহংসর্বস্বতার সংকীর্ণতায় আবদ্ধ থাকে অধিকাংশ। কিন্তু স্বার্থপরতার নোনাজলে বাস

[৬] *স্বামি শিষ্য সংবাদ (পূর্ব্ব কাণ্ড),* শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পৃ. ১০৫।

করেও মানুষ যে তার বুকের মধ্যে পরার্থ চিন্তার বীজ বপন করে চলে, একটু তলিয়ে দেখলেই তা ধরা পড়বে। দৈনন্দিন সংবাদপত্রে চোখ রাখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি দুষ্কর্মের ঘটনাগুলি সামনের সারিতে তুলে এনে সংবাদ মাধ্যমগুলি যখন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, তখন আসলে এটাই স্পষ্ট হয় যে পরার্থ চিন্তার বীজ তার মধ্যে নিহিত থাকে বলেই ব্যতিক্রমী ওইসব ঘটনা বেশি করে পাঠকের নজরে পড়ে। অধিকাংশ মানুষ যা করে না, বা তাদের বিবেক যাতে সায় দেয় না, ওই অপকর্মগুলো সেই ব্যতিক্রমী ঘটনার মধ্যেই পড়ে। ব্যতিক্রমগুলোকে বাদ দিলে যা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক তা হল পরিবারের জন্য, গোষ্ঠীর জন্য, সমাজের জন্য এমন কিছু না কিছু করা, যাতে সেই সমাজের হিতরক্ষা হয়। অবশ্য শুধু মানুষের কেন, এই পরার্থ প্রবৃত্তি মনুষ্যেতর পশুদের মধ্যেও কিছু মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। সন্তান, সঙ্গী, সঙ্গিনী কিংবা দলভুক্ত সদস্যদের জন্য আত্মত্যাগের কিছু নমুনা পশুকুলের মধ্যে লক্ষ্য করি আমরা। তবে কিনা তাদের ওই প্রবৃত্তি পুরোপরি সহজাত। কিন্তু মানুষ শুধু সহজাত প্রবৃত্তির দাস নয়। যা সহজাত বিচারশীলতার শুদ্ধাগ্নিতে তার যথাযথতা পরখ করে নিয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয় সে, তাই তার মধ্যে যে পরার্থ প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় তা আকস্মিক বা আপতিক নয় বরং ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন।

এই দাবির সাথে হয়তো সহমত হবেন না অনেকে। তারা বলবেন, নিজের ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতেই যে মানুষ নাচার, অন্যের ভালোর জন্য তার ভাবিত হওয়ার দাবি অনেকখানি বাড়াবাড়ি। একথা ঠিকই যে নিজের ইচ্ছাগুলোকে রূপায়িত করার স্বাধীনতাই মানুষের নেই। জর্জ বার্নার্ড শ হয়তো ঠিকই বলেছেন যে—

> স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। কারণ দিনের অর্ধেকটা সময়ই মানুষের কেটে যায় প্রকৃতির ক্রীতদাসত্বে। খাদ্যগ্রহণ, পান, নিদ্রা, স্নানাদি কর্ম— যেগুলো জীবন রক্ষার অপরিহার্য পূর্বশর্ত,

> সেগুলো সম্পাদনেই প্রায় বারো ঘণ্টা অতিবাহিত হয় তার। অবশিষ্ট যে বারো ঘণ্টা পড়ে থাকে তার মধ্যে প্রায় আট ঘণ্টা নিজের পরিবারের জন্য কিছু না কিছু উৎপাদন বা সম্পাদন করতে হয় তাকে। এভাবে একজন মানুষের দিনের অধিকাংশ সময়ই চলে যায় প্রকৃতির এবং অপ্রাকৃত বিভিন্ন দাবীর ক্রীতদাসত্বে। কাজেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার হাতে মাত্র চার ঘণ্টা থাকে যেটাকে ইচ্ছা মত ব্যয় করতে পারে মানুষ।[৭]

কিন্তু এখানেও তার ইচ্ছাপূরণ নির্ভর করে কাঙ্খিত বস্তু ও অর্থের পর্যাপ্ত সরবরাহের উপর। এভাবে স্বাধীনতার নামে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ যে মানুষ পরের ভাবনায় ভাবিত হওয়া তার পক্ষে বিলাসিতা নয় কি?

কিন্তু ওই বিলাসিতা যে মানুষ দেখায় তার প্রমাণও আমরা পায়। 'পদে পদে শত শত নিষেধের ডোরে' যার আচরণ বাঁধা, পিতা মাতা বা শিক্ষকের উপদেশ— "মানুষের জন্য কিছু কর", "মানুষের সেবা কর" শুনে তার বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল শত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করে ওই সব আহ্বানে সাড়া দিতে। পুত্র, কলত্র ও পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনে যার নাভিশ্বাস উঠছে অন্যের জন্য সামান্য কিছু করতে পারার মধ্য দিয়ে সে অদ্ভুত এক ধরনের আত্মপ্রীতি লাভ করে। সুযোগ ও সময় পেলেই নিজের ও পরিবারের বৃত্তের বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা মানসিকতা তার মধ্যে অন্তশ্রুত থেকে যায়।

প্রশ্ন হল এই পরার্থ প্রণোদনের নিগড় কোথায়? জন্মগত ভাবে অহংমুখী যে মানুষ তাকে সমাজমুখী, পরার্থে কাতর করে তোলে কোন হৃদয়বৃত্তি? আর পাঁচটা প্রাণীর মতো মানুষও জন্ম লাভ করে কতকগুলি স্বাভাবিক চাহিদা, প্রবণতা ও বৃত্তি নিয়ে। যে অভাববোধ একটি পশুকে কর্মে প্রবৃত্ত করে, সেই একই অভাব পূরণের লক্ষ্যে প্রবৃত্ত হতে শেখে

---

[৭] *Freedom,* G. B. Shaw, Broadcast address, B.B.C. 17th June 1935.

মানবশিশু। এই প্রবৃত্তি একান্তই স্বার্থপ্রণোদিত। রক্তের উপাদানগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, শ্বসন, রেচন, শারীরিক অনুশীলন— এজাতীয় জৈবিক প্রয়োজনগুলির দ্বারা তাড়িত হয়েই মানুষের যাবতীয় কর্মতৎপরতা। সেখানে পরার্থ ভাবনার কোনো স্থান নেই। নিজেকে সুখী করার ও খুশি করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থেকে যে শিশুর সামাজিক আচরণের সূত্রপাত সমাজের ক্রোড়ে, শৈশব থেকে বাল্য, কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে তার মধ্যে জন্ম নেয় পরার্থবোধ। কিন্তু আত্মপরতা থেকে পরার্থপরতা মানুষের মধ্যে দানা বাঁধে কীভাবে?

এর উত্তর দিতে গিয়ে কেউ বলতে পারেন, প্রথাগত পরম্পরাকে অনুসরণ করতে গিয়েই মানুষের মধ্যে পরার্থপরতা জন্ম নেয়। সন্ত্রাসবাদী পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশুর যেমন সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠার সম্ভবনা বেশি থাকে, তেমনি নৈতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা শিশুর মধ্যে যে পরার্থ প্রবৃত্তি দেখা দেয় তা পরম্পরার অন্ধ অনুসরণ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এই সাফাই যথেষ্ট বলে মনে হয় না। কারণ বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া অভ্যাস অচিরেই শিথিল হয়ে যায় যদি না তাতে অন্তরের সায় থাকে। পর কল্যাণের ভাবনা মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে বলেই পরার্থে আত্মত্যাগের বীরগাঁথাগুলি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাকে ওইরূপ কাজে উদ্‌বুদ্ধ করে। সুতরাং অন্তরের কোনো তাগিদ থেকে মানুষ অন্যের জন্য ভাবিত হয় সেই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। নৈতিক বাধ্যতার এই উৎসটি আবিষ্কার করা নীতিদর্শনের অন্যতম দায়িত্ব। মানুষ কী কারণে নৈতিক হয়, নৈতিক জীবন যাপনের তাগিদ ঠিক কোথায়, সে রহস্যের উন্মোচন সম্ভব হলে সেই আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে, যা ওই ধরনের বাধ্যতাবোধ মানুষের মধ্যে উৎপন্ন করবে। নৈতিক বাধ্যতা বোধের উৎসটিকে জানতে পারলে মানুষ কেন অন্য মানুষের প্রতি আচরণের সময় ঔচিত্য বোধের দ্বারা চালিত হয় তা যেমন জানা যাবে, তেমনি পশু, পাখি, গাছপালা—

এসবের প্রতিও যে নৈতিক আচরণ মানুষ করে, বা করতে চায়, তার কারণটিও খুঁজে পাওয়া যাবে।

১.২ পরার্থবোধের উৎস সন্ধান: কিছু প্রচলিত ব্যাখ্যা

মানুষ কেন পরার্থে কর্ম করে? তার আত্মত্যাগের প্রণোদন কোথা থেকে আসে সে বিষয়ে নানা ব্যাখ্যা সাধারণ্যে প্রচলিত। এই বিষয়ে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার আগে এরকমই কিছু প্রচলিত মতের উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক।

১.২.১ পরার্থ ভাবনার ধর্মীয় ব্যাখ্যা

পরার্থ ভাবনার বাধ্যতা বা দায় ঠিক কোথায়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সাধারণ ঈশ্বর বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের আদেশের কথা বলে থাকেন। তাঁরা বলতে পারেন নৈতিক কর্ম সম্পাদনের এবং অনৈতিক কর্ম থেকে বিরত থাকার যে তাগিদ আমরা মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করি, তার উৎস হল ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বতভাবে মঙ্গলময়। তিনি মানুষ ও জগতের স্রষ্টা। মানুষের কাজ হল স্রষ্টা হিসাবে সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। আর একমাত্র ঈশ্বরাদেশ পালনের মধ্য দিয়ে মানুষের পক্ষে নৈতিক জীবন যাপন করা সম্ভব। তাই যা ঈশ্বরাদৃষ্ট তা পালন করতে গিয়ে মানুষ নৈতিক হয়ে ওঠে। এই মতবাদের একজন প্রবক্তা হলেন দার্শনিক পেইলি।

এক দিকে অনন্ত নরক বাসের ভ্রূকুটি অন্যদিকে সুখী জীবনের প্রলোভন ও স্বর্গ বাসের হাতছানি— এই দুয়ের প্রভাবে পাপ ও পুণ্যের মধ্যে তফাৎ করতে শেখে মানুষ। আর এভাবেই ঈশ্বরের নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে স্বভাব স্বার্থপর মানুষ পরার্থপর ও নৈতিক হয়ে ওঠে। তাই ঈশ্বরাদেশই মানবীয় পরার্থবোধের মূল উৎস।

এভাবে ঈশ্বরাদেশের দোহায় দিয়ে নৈতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির চেষ্টা ধর্মেও হয়েছে। প্রচলিত ধর্মগুলির অধিকাংশই ঈশ্বরবাদী। সেই ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে ধর্মগুলির মধ্যে মতান্তর থাকলেও তিনিই যে সর্বনিয়ন্তা, সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের জাদুদণ্ড যে তাঁরই হাতে এই বিষয়টিতে ইসলাম থেকে খ্রিষ্ট সকল ঈশ্বরবাদী ধর্মই একমত। অবশ্য জৈন, বৌদ্ধের মতো নিরীশ্বরবাদী কিছু ধর্মও রয়েছে, যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় অনুশাসনকে প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণের দাবি রাখে। ধর্মগুলির লক্ষ্য যাই হোক একটি নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বিচার করলে ধর্মীয় অনুশাসনকে মেনে চলা একটি সম্প্রদায়গত দায়। পিতা, মাতা, পূর্বপুরুষ, আত্মীয়-পরিজন যে নীতি নিয়মকে মান্য করে এসেছে সেই পরম্পরাকে অমান্য করলে সে তার সমাজে নিন্দিত হবে বা সম্প্রদায় থেকে বিতাড়িত হবে— এই আশঙ্কা একজন ব্যক্তির মধ্যে থাকে। ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের ওই দুঃসহ পরিণতি মানুষকে নিজ নিজ ধর্মীয় গোষ্ঠীর অন্দরে প্রচলিত নিয়মগুলিকে মান্য করতে বাধ্য করে বলে দাবি করেন অনেকে।

১.২.২ বাধ্যতাবোধ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

এভাবে কোনো অতিলৌকিক সত্তার অঙ্গুলিহেলনে বা ধর্মের ধ্বজাধারীদের ভয়ে মানুষের নৈতিক ও পরার্থপর হয়ে ওঠার ব্যাখ্যা সন্তুষ্ট করতে পারেনি প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানমনস্কদের। নৈতিক বাধ্যতার উৎস হিসাবে ভগবত বিধিবিধানের বা ধর্মগুরুর জারি করা হুকুমের বিরুদ্ধে তারা মেনেছেন রাষ্ট্রীয় শাসনকে। সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষকে শাসন ও পীড়নের প্রভূত ক্ষমতা রাখে। প্রাচীনকাল থেকেই সমাজ ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রণের একছত্র অধিকার ভোগ করে এসেছে। দুর্খাইম (Durkhim) ও তাঁর অনুগামী সমাজতাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি অঙ্গনই একসময় পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হত, যে সমাজে ব্যক্তি

বাস করে তার দ্বারা।[৮] বৃহত্তর অমোঘ সামাজিক শক্তির কাছে ব্যক্তি ছিল তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র, তৃণ হতে দীনতর। পরাক্রমশালী ওই শক্তির মুখোমুখি যখন ব্যক্তি হত, তখন সভয় ভক্তিতে সামাজিক নীতিনিয়মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ছাড়া মানুষের করার কিছুই থাকত না। এই সমাজ, যা পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে, নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে নিয়ম কানুন বা বিধি নিষেধকে আইন হিসাবে তার সদস্যদের উপর চাপিয়ে দিত, তাকেই নৈতিক আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করত মানুষ। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শক্তিকে এক অতিলৌকিক প্রভাব রূপে গণ্য করত সে। তাই সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের ভীতি যেমন তার মধ্যে প্রকট ছিল, তেমনই প্রচ্ছন্ন ছিল এই বোধ যে, আরোপিত ওইসব নিয়ম আসলে তাদেরই মঙ্গলের জন্য। এভাবে রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘনের শাস্তির ভয় এবং আইন মান্য করার মধ্যে নিজের মঙ্গল নিহিত রয়েছে— এই দ্বিবিধ তাগিদ স্বার্থপর মানুষকে পরার্থপর হতে বাধ্য করে।

১.২.৩ আত্মসিদ্ধির উপায় হিসাবে পরার্থচিন্তা

সাধারণ ভাবে যে সমাজে আমরা বাস করি, তার কিছু প্রথা ও ঐতিহ্য থাকে যেগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকে সমাজের প্রতিটি সদস্য। সমাজে তার অস্তিত্ব ও প্রগতি রক্ষার তাগিদে সময় সময় কিছু প্রথা ও অধ্যাদেশ জারি করে থাকে সদস্যদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য। সমাজে বসবাসকারী সদস্যরা ওইসব আচরণধারাকে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। কোনো ব্যক্তি লক্ষ্য করে যে, এককভাবে সে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য ছাড়া তার আত্মরক্ষা ও উদ্দেশ্যরক্ষা হয় না। তাই আত্মস্বার্থ রক্ষার স্বার্থেই সমাজের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। যেসব নিয়ম প্রথা ও অনুশাসন

[৮] *Philosophy of Religion*, John H. Hick, p. 30.

সমাজ নিজের স্বার্থে সদস্যদের উপর চাপিয়ে দেয়, আত্মরক্ষার তাগিদেই সমাজস্থ ব্যক্তি সেগুলিকে মেনে চলতে বাধ্য থাকে। সামাজিক অনুশাসন মেনে চলার অভ্যাস থেকেই কোন ধরনের আচরণ করণীয় এবং কোন ধরনের আচরণ অকরণীয় সে তা শিখে ফেলে। সমাজের চোখে যেসব ব্যক্তি মহান বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেই মহৎ ব্যক্তিদের কর্ম ও আচরণধারা আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। ওইসব দৃষ্টান্ত অনুসরণ যেমন মানুষ করে, তেমনি নিজের বুদ্ধি বা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা ওই আচরণ ধারাকে সমর্থন করার যুক্তিও সে আবিষ্কার করে। যুক্তি বা নীতির মানদণ্ডে নিজের বা অন্যের কোন কাজ করণীয় এবং কোন কাজ নয়, তার বিভাজন করতে সমর্থ হয় সে।

১.২.৪ পরার্থ ভাবনায় প্রশংসা ও নিন্দার ভূমিকা

যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে থাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গির উৎস ঠিক কী? এর উত্তরে হয়তো কেউ কেউ মানুষের মধ্যে বর্তমান এক আধ্যাত্মিক সত্তার কথা বলবেন। কেউ কেউ হয়তো শাস্ত্রগ্রন্থের প্রভাবকে এর জন্য দায়ী করবেন। হয়তো নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভের ক্ষেত্রে এসবের ভূমিকা আছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় ভালো-মন্দ, যথোচিত-অনুচিত এদের মধ্যে যে তফাৎ আমরা করতে শিখি তা আমরা করি কী করে? কী করে বুঝি কোনটা গ্রাহ্য এবং কোনটা ত্যাজ্য? বাস্তব জীবনে গ্রহণ ও ত্যাগের যে নীতি অবলম্বন করে আমাদের পথ চলতে হয় তাদের উৎস কী?

অধ্যাপক গিলফোর্ড তাঁর ‘General Psychology’ গ্রন্থে মানুষের মধ্যে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে জন্মায় তার একটি মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—

> কোন আচরণের অনুশীলন কাম্য এবং কোনটির অনুষ্ঠান অকাম্য তা একটি শিশু বুঝতে শেখে তার জন্মের পর। জন্মের পর থেকে মা, ধাত্রী বা কোনো পরিজনের তত্ত্বাবধানে সে বড়ো হয়ে

ওঠে। এই বড়ো হওয়ার পথে সে ক্রমশ বুঝতে শেখে তার মা বা তত্ত্বাবধায়ক ঠিক কোন ধরণের আচরণ করলে সেটা তার পক্ষে সুখের হয়, আর কোন ধরণের আচরণ করলে সেটা তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়। সে লক্ষ্য করে কিছু আচরণ আছে যেগুলো সে করলে তার মা বা পরিজন খুশি হন। যেমন, তারা হাসিহাসি মুখ করে কোমলভাবে তাকে স্পর্শ করে মিষ্টি সুরে তাকে কিছু বলে। অন্যদিকে আরও কিছু আচরণ আছে যেগুলো সে যখন করে তখন তার প্রতি প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। কিছু আচরণ আছে যেগুলো সে করলে মা বা পরিজনের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে যায়। গলার স্বর হয় কর্কশ এবং কঠোরভাবে তাকে স্পর্শ করা হয় বা নাড়াচাড়া করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্যদের কোন আচরণ তার পক্ষে সহনীয় বা সুখের এবং কোন আচরণ অসহনীয় বা দুঃখের এই দুয়ের মধ্যে তফাৎ করতে শেখে সে। আর ঠিক সেই সেই আচরণগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা করে সে যেগুলো করলে তার প্রতি অন্যদের প্রতিক্রিয়া আনন্দের বা সুখের হবে। অন্যদিকে যে সব আচরণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় সেগুলোকে যথাসম্ভব পরিত্যাগ করতে প্রয়াসী হয় সে।[৯]

এভাবে গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যের, ভালো ও মন্দের মধ্যে প্রাথমিক একটা তফাত করতে সমর্থ হয় শিশু। এই ভালো ও মন্দের বোধ মূলত পুরস্কার ও শাস্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যতই শিশু ছোটো থেকে বড়ো হতে থাকে, ততই শিশু পরিবারের সংকীর্ণ চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বৃহত্তর সমাজে এসে পড়ে। সে বুঝতে শেখে তার কোন আচরণগুলো পরিবার বা সমাজের কাছে অনুমোদন পায় আর কোনগুলো পায় না। যে যে আচরণগুলো পরিবার পরিজন ও সমাজের প্রশংসা আদায় করে সেগুলোর অনুষ্ঠান করা আর তার যে আচরণ পরিবার ও সমাজে নিন্দিত হয় সেগুলো পরিত্যাগ করার এক স্বাভাবিক প্রবণতা গড়ে ওঠে তার মধ্যে। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে প্রশংসা ও নিন্দা, পুরস্কার ও তিরস্কার— এই দুটি তার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি রচনা করে।

[৯] *General Psychology,* J.P Guilford, p. 118-119.

১.২.৫ বিবেকের নির্দেশ ও পরহিত ভাবনা

এইভাবে ঈশ্বরের আদেশ, ধর্মীয় কানুন বা রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যে নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যা অনেককে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কারণ নৈতিক বাধ্যতাবোধ কোন বাহ্য শক্তির প্রভাব থেকে আসে না। এটা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে প্রায় ক্ষেত্রেই দায় পালনের মূলে কোনও না কোনও বাহ্য শক্তির প্রভাব থাকে। কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে যে বাধ্যতাবোধের দ্বারা চালিত হয়ে আমরা পরার্থপর হই তার উৎস বাহ্যিক কোনো শক্তির নির্দেশ বা পুরস্কারের প্রলোভন বা তিরস্কারের ভীতি নয়। যে কাজ ভালো বলে আমরা বুঝি বা যে কার্যে আমাদের বিবেক সায় দেয় তা সম্পাদনের একটা আকুতি অন্তর থেকে বোধ করি আমরা। প্রশ্ন হল অন্তর থেকে আসা এই যে শুভবুদ্ধি, পরের জন্য কিছু করার এই যে আন্তরিক তাগিদ এর উৎস কী? সমাজ, রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম বা অতিলৌকিক সত্তার ভয়ে নয়, বরং আপন অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত হয় এই নৈতিক তাগিদ। বিবেকবোধই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডিকে অতিক্রম করে অন্যের স্বার্থে, সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে। এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অন্যের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হয় মানুষ। সেখানে পেনাল কোডের চাপ, ধর্মের অনুশাসন কোনওকিছুই থাকে না। তার অন্তঃকরণই তাকে প্রবৃত্ত করে পরার্থে কর্ম করতে।

১.২.৬ পরার্থপরতার কারণরূপে মানুষের প্রকৃতি

প্রত্যেক মানুষেরই একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতি বা স্বভাব রয়েছে। এই স্বভাবই তাকে নৈতিক করে তোলে। আসলে মানুষের প্রকৃতিই এমন যে তার দিক থেকে নৈতিক জীবনকে বেছে নেওয়া খুব স্বাভাবিক ও বিচারসম্মত একটা ঘটনা। কোনো লক্ষ্য পূরণকে সামনে রেখে

মানুষ নৈতিকতার অনুশীলন করে না, কিংবা কোনো উচ্চতর নৈতিক নিয়ম থেকেও মানুষের নৈতিক হওয়ার ঘটনাটি নিঃসৃত হয় না। অন্যান্য পশুর মতো মানুষও এক ধরনের প্রাণী, কিন্তু বিচারশীলতার নিরিখে সে অন্য সকলের থেকে আলাদা। মানুষের এই স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্যটির কারণেই বিচারশীল জীব হিসাবে বিশেষ ধরণের কিছু আচরণ খুব যুক্তিসম্মত ভাবেই তার কাছে প্রত্যাশিত। ওই প্রত্যাশিত মানের আচরণ করতে সে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে তার আপন প্রকৃতিই তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, কৃত আচরণটি যুক্তিযুক্ত নয়। একটি কুকুর বা বেড়াল জাতীয় প্রাণীর কাছে যে আচরণ প্রত্যাশিত নয়, মানুষের কাছে সেটাই প্রত্যাশিত। বিচারশক্তি বা Power of Understanding-এর কারণেই জ্ঞানের রাজ্যে সব পশুকে সরিয়ে মানুষকে অনেক বেশি অগ্রসর হতে সক্ষম করে। শুধু তাই নয়, এমন কিছু আচরণধারাকে অনুশীলন করতে মানুষকে প্রণোদিত করে যাকে নৈতিক বলা যায়। যে বুদ্ধিমত্তার স্বাভাবিক স্ফুরণ জ্ঞানে তারই স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটে আচরণে। আর যার কাছে যা স্বাভাবিক, যার সম্পাদন যার দ্বারা হামেশাই হয়ে থাকে, তার কাছ থেকে সেই ক্রিয়ার সম্পাদন আমরা প্রত্যাশা করে থাকি। একটি পাখির কাছে যেমন ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাওয়া এবং শাবকের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে বাসায় ফেরার ঘটনাটি স্বাভাবিক, তেমনি আপন সন্তানের পরিপোষণের পাশাপাশি অন্যের জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া একটি স্বাভাবিক তথা যুক্তিসঙ্গত আচরণ; যার ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম আমাদের কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়। একটি পাখি যেমন শাবকের পরিপোষণ সহজাত প্রবৃত্তির বশে করে থাকে, তেমনি মানুষও সহজাত প্রবৃত্তির বশে জীবনের অধিকাংশ কাজ সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু মানুষের মধ্যে অতিরিক্ত হিসাবে যা রয়েছে সেই বিচারশক্তিই তাকে সহজাত প্রবৃত্তির গণ্ডি অতিক্রম করে আত্মস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে।

১.৩ পাশ্চাত্ত্য নীতিতত্ত্বে নৈতিক বাধ্যতা

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে নীতিচিন্তা তথা পরার্থ ভাবনার সূচনা গ্রীক দর্শনের সময় থেকে শুরু হয়। কালিক বিচারে গ্রীক দর্শনের এই ধারাটিকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়— প্রাক্ সক্রেটিস পর্ব এবং সক্রেটিস-উত্তর পর্ব। প্রাক্-সক্রেটিস পর্বে আমরা পাই থেলস, অ্যানাক্সিম্যানডার, পারমিনাডিস, হেরাক্লিটাস, ডেমোক্রিটাস প্রভৃতি বহু দার্শনিককে। 'জগৎ কী ও কেন' - এই প্রশ্নই এইসব দার্শনিকদের ভাবনায় গুরুত্ব লাভ করেছিল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সমন্বিত ও জীব অধ্যুষিত এই পৃথিবীর উৎপত্তির মূলে ঠিক কী রয়েছে সেই জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে এঁরা এক এক ধরনের জগৎ তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এই প্রাক্-সক্রেটিসীয় দর্শনে জগতকে জানার প্রচেষ্টাই ছিল মুখ্য। মানুষের জীবন কিভাবে আরও সুবিন্যস্ত হতে পারে এবং আরও ভালোভাবে বাঁচতে মানুষ কোন পথ গ্রহণ করবে সেই সব জিজ্ঞাসা তখন তাঁদের মনে দানা বাঁধেনি। জীবন, মৃত্যু ইত্যাদি সবকিছুকে স্বাভাবিক জাগতিক ঘটনা হিসাবেই ধরা হত। জগতের অস্তিত্ব যেমন অনিবার্য, মানুষের জীবনধারাও তেমনি অবশ্যম্ভাবী হিসাবে গণ্য হত। দর্শন আলোচনার কেন্দ্রে ছিল আদি কারণানুসন্ধানের মাধ্যমে জগৎ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যে নীতিচিন্তার উদয় সক্রেটিসের জীবনকে কেন্দ্র করে। যুক্তির আলোয় পথ চলার যে আহ্বান তিনি যুবকদের কাছে রেখেছিলেন, ন্যায় অন্যায়ের তফাৎ করার যে শিক্ষা তিনি পথচারীদের দেওয়ার চেষ্টা করতেন, সর্বপরি ন্যায়ের প্রশ্নে, নীতির প্রশ্নে জীবন বিসর্জনের যে মহান দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন তা ইউরোপীয় মানসে নৈতিক চিন্তার জন্ম দেয়। প্লেটো রচিত সক্রেটিসের ডায়ালগগুলি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি যে, মনুষ্যবৃত্তিগুলিকে জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যায় প্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে। তাই জগৎ

ও জীবন আমাদের কাছে মানবিক জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠেছে। জগতের আদি কারণানুসন্ধানের দার্শনিক প্রশ্নটি 'মানব জীবনের লক্ষ্য কী?' এই নৈতিক প্রশ্নটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে।

১.৩.১ সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্ব ও কর্তব্যবোধ

প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে জগতের স্বরূপ, প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ এবং নৈতিকতার স্বরূপ সংক্রান্ত যে আলোচনা করেছেন, তা পরস্পর সংযুক্ত তাত্ত্বিক পর্যালোচনার আকার ধারণ করেছে। 'ভালো' বা 'নৈতিক' বলতে আমরা কী বুঝি, কোন মানব আচরণ 'ভালো' বা 'মন্দ', 'নৈতিক' বা 'অনৈতিক', 'উচিত' বা 'অনুচিত'— এই ধারণা কেবল বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, প্রকৃত দার্শনিক অনুসন্ধানের মৌলিক যে চর্চা তার সঙ্গেও এর যোগ নিবিড়।

প্লেটোর নৈতিক মতবাদ Eudaemonism বা কল্যাণবাদ নামে পরিচিত। তিনি মানবজীবনে এক পরম কল্যাণ বা Summum bonum-এর কথা বলেছেন যার সাথে আনন্দের যোগ আছে।[১০] এই কল্যাণময় জীবন বলতে প্লেটো যেমন ইন্দ্রিয়সুখ সর্বস্ব জীবনকে বোঝেননি, তেমনি শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির জীবনকেও নির্দেশ করেননি। কারণ শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির জীবন হল সুখবর্জিত জীবন। তাই এধরণের জীবন আমাদের কাম্য হতে পারে না। কাজেই প্লেটোর মতে, কল্যাণময় জীবন হল এমন যা বিচারবদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সুখ এই দুইয়ের সম্মিলিত রূপ; যেখানে বৌদ্ধিক সুখের পাশাপাশি ইন্দ্রিয় সুখেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। ইন্দ্রিয়সুখ বলতে তিনি নির্দোষ ও সংযত ইন্দ্রিয় সুখকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, যে কোনও পানীয়কে আকর্ষণীয় করতে হলে যেমন মধু ও জলের সুষম

[১০] *A History of Philosophy (Vol-I)*, F Copleston, p. 216.

মিশ্রণের প্রয়োজন, তেমনি সুখের অনভুতি এবং বিচারবুদ্ধির সংযম— এই দুইয়ের সংমিশ্রণই মানুষের জীবনকে কল্যাণময় করে তুলতে পারে। প্লেটোর মতে, এই জড়জগৎ হল আদর্শ জগতের একটি নকল মাত্র। সামান্য বা আকারের জ্ঞানই হল সর্বোচ্চ, জড়বস্তুর জ্ঞান হল তুচ্ছ জ্ঞান। যিনি কল্যাণময় জীবনের অধিকারী তিনি অবশ্যই যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ সামান্য বা আকারের জ্ঞানের অধিকারী হবেন। মানুষের পরম পুরুষার্থ বা পরম কল্যাণ হল ঈশ্বরের জ্ঞান, যিনি আকার বা সামান্যের স্রষ্টা।

প্লেটো মনে করেন, মানব জীবনের লক্ষ্য হল বিচারবদ্ধিসম্পন্ন জীবনযাপন করা এবং নৈতিক জীব হিসেবে মানুষের উচিত তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। মানুষের সমগ্র প্রকৃতির পূর্ণতা অর্জনই হল আমাদের একমাত্র নৈতিক আদর্শ এবং এই আদর্শ লাভের সঙ্গে যক্ত রয়েছে আনন্দ বা কল্যাণ। এই আনন্দ বা কল্যাণ শুধু ইন্দ্রিয়সুখের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে না। তার জন্য বৌদ্ধিক সুখও প্রয়োজন। এই বৌদ্ধিক সুখ সদ্‌গুণের অনুশীলন ছাড়া সম্ভব নয়। প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থে চারটি সদ্‌গুণের (cardinal virtues) কথা বলেছেন— প্রজ্ঞা (wisdom), সাহসিকতা (courage), মিতাচার (temperance) এবং ন্যায়পরায়ণতা (justice)।[১১] শেষ দুটি সদ্‌গুণের সঙ্গে পরকল্যাণের গভীর যোগ। যিনি ন্যায়পরায়ণ হবেন তিনি কখনোই আপন স্বার্থে অন্যকে ব্যবহার করতে পারেন না। ন্যায় যে শক্তিমানের বা বলবত্তরের স্বার্থরক্ষা নয় সক্রেটিসের বয়ানে থ্রাসিমেকাসের মত খণ্ডন করতে গিয়ে সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন প্লেটো।[১২] শুধু বন্ধুদের স্বার্থরক্ষা এবং শত্রুদের ক্ষতি সাধনও প্লেটোর মতে ন্যায় নয়। অন্যের প্রতি অমিতাচারকে অন্যায় হিসাবেই গণ্য করেছেন প্লেটো।

[১১] *The Republic of Plato*, H. M. Tichenor, (ed.), p. 30.

[১২] Ibid. p.11.

অ্যারিস্টটল ভালোত্বের ধারণাকে কোনো বাহ্য বিষয় হিসাবে দেখেননি। তাঁর মতে এটি কোনো ক্ষমতা নয়, বরং মানব চরিত্রে নিহিত থাকা এক ধরনের প্রবণতা, যা জীবনের আচরণে ও চর্চায় বিকশিত হতে হতে অবশেষে পূর্ণ নৈতিক মূল্যের সন্ধান দেয়। তিনি এই নৈতিক গুণের উৎসরূপে মানবীয় বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার কথাই স্বীকার করেছেন। অ্যারিস্টটলীয় নীতিতত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানবজীবনের লক্ষ্যের ধারণাটি। তাঁর মতে মানুষের অস্তিত্ব নিছক একটি ঘটনা নয়, কার্য হিসাবে তার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। অ্যারিস্টটল যে পরম কারণ (Final Cause)-এর কথা বলেছেন সেখানে প্রতিটি জীবনের, প্রতিটি কার্যের বিকাশ যে কোনো বৃহত্তর পরিকল্পিত সত্তার অংশমাত্র তা বলা হয়েছে।

অ্যারিস্টটলের মতে মানুষের মধ্যে যে নৈতিক গুণ সহজাতভাবে অস্তিত্ববান তার প্রকাশ ঘটে তার কর্তব্যমুখী আচরণে এবং সৃজিত হয় নৈতিক মূল্য। অ্যারিস্টটল যে সুবর্ণ মধ্যম বিন্দু নির্বাচনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে নৈতিক জীবনের সম্পূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে। তাঁর মতে যেকোনো চরমতাই অনৈতিক। অথচ মানুষের যে অবৌদ্ধিক সত্তা এবং তাড়নাগুলি আছে, তা মানুষকে ওই চরম বিন্দুর দিকে টানে। অন্যদিকে মানুষের বৌদ্ধিক সত্তা, প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি মানুষকে চরম বিপরীতমুখী বিন্দুর থেকে সরিয়ে মধ্যম বিন্দুর দিকে নিয়ে আসে। অ্যারিস্টটল মনে করেন প্রতিটি মানুষ আলাদা, তাই তার বৌদ্ধিক সত্তায় সার্বিকতার নীতি কার্যকর হলেও, অবৌদ্ধিক জৈব-মানব তাড়নায় প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র। এইজন্য মধ্যম বিন্দু সকলের জন্য এক এবং অভিন্ন অর্থ বহন করে না। অ্যারিস্টটল মানবজীবনের এই দ্বন্দ্বকে অবলোকন করেছিলেন এবং নৈতিক মূল্যের উৎসরূপে বৌদ্ধিক ক্ষমতার উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু নৈতিকতার যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে সহজাত; তাকে নিজ আচরণে ও অভ্যাসে প্রতিফলিত করতে গেলে, অবৌদ্ধিক সত্তাজাত চরমতার

অভিমুখী যে তাড়না, তাকে দমন করতে হয়, নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এই দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে ওঠার ক্ষমতাও মানুষের আছে।

'Nicomachean Ethics' গ্রন্থে দেখা যায় যে, অ্যারিস্টটল আনন্দ বা Happiness-কে মানবজীবনের লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের ধারণার সঙ্গে অ্যারিস্টটলীয় আনন্দের ধারণার মৌলিক পার্থক্য থাকলেও, মানব জীবনের যে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে— এই বিষয়ে উভয় মতের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অ্যারিস্টটলের মতে এই আনন্দময়তার প্রাপ্তি ও উপলব্ধি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের জন্য নয়। মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব, তাই তার সামাজিক সত্তাই এই লক্ষ্যসাধনে অভিমুখ। তাঁর মতে কোন কাজ সুখদায়ক হওয়ার জন্য ভালো হয় না, বরং কাজটি ভালো বলেই সুখ-প্রদায়ক হয়।[১৩]

অ্যারিস্টটল মনে করেন যে, মানুষের অন্তরেই মঙ্গলময়তা বিকাশের প্রবণতা বর্তমান, মানুষের তা অর্জন করার প্রয়োজন নেই। মানুষ যা করতে পারে, তার কাছে যা কাম্য, যা নৈতিক বলে বিবেচিত, তা হল চর্চার মাধ্যমে সেই সদ্‌গুণাবলি বিকাশে সচেষ্ট হওয়া। এই জীবনময় অনুশীলনই মানুষকে সমৃদ্ধ করে, বিকশিত করে এবং মঙ্গলের উৎস করে তোলে। অর্থাৎ মানুষ নিজেই নৈতিকতার উৎস। মানুষকে খুঁজে নিতে হয় সদগুণের সেই মধ্যবিন্দু, যা চরমতার দূরবর্তী।[১৪] যে কোনো চরমতাই নিরানন্দের কারণ। তাই গুণচর্চার লক্ষ্য হল গুণটির প্রাসঙ্গিক মধ্যবিন্দু বা অ-চরম (non-extreem) অবস্থানকে আঁকড়ে থাকা। আমাদের জৈবিক তাড়না, নিস্পৃহতা, অজ্ঞান - এসব নেতিবাচক অবৌদ্ধিক সত্তাগুলো হয়তো আমাদের চরম সীমার দিকে টানে কিন্তু বুদ্ধি মানুষকে ভারসাম্য রক্ষার

[১৩] *A Critical History of Greek Philosophy*, W. T. Stace, p. 315.

[১৪] Ibid, p. 318.

চেতনা দেয়। একজন নৈতিক ব্যক্তি আনন্দের চরম সীমায় যেমন অবস্থান করবেন না তেমনি দুঃখের চরম সীমাতেও তিনি থাকবেন না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব গুণ ও ক্ষমতায় ভারসাম্যের প্রবল সচেতন প্রচেষ্টায় দুই চরম সীমার মধ্যবিন্দুতে স্থিতধী হয়ে থাকবেন তার কর্মে, বিকশিত করবেন এক সাত্ত্বিক আনন্দ যা গ্রিক ভাষায় Eudaemonia নামে খ্যাত। মানুষের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তুকে অ্যারিস্টটল Eudaemonia বা আনন্দ বলেছেন। তাঁর মতে এই Eudaemonia-এর জীবন যিনি যাপন করেন তিনি কখনই অন্যের অহিতে প্রবৃত্ত হতে পারেন না। এভাবে পরম সুখের জীবনের আদর্শের সঙ্গে পরহিতে কর্মের আদর্শটি অ্যারিস্টটলীয় দর্শনে মিলে যায়।

১.৩.২ বাধ্যতাবোধ প্রসঙ্গে সুখবাদী ব্যাখ্যা

যে মতবাদগুলি কোনও ন-নৈতিক (Non-moral Value) মূল্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি কাজ বা নিয়মের ন্যায্যতা, অন্যায্যতা বিচারের প্রস্তাব দেয় সেই মতবাদগুলিকে বলা হয় উদ্দেশ্যবাদ (Teleological Theory)। যেহেতু উৎপাদিত ফলাফল বা পরিণামের নিরিখেই সংশ্লিষ্ট কাজটির ভালোত্ব বা মন্দত্ব নির্ধারণের প্রস্তাব দেয় মতবাদ তাই এই ধরণের মতবাদকে পরিণামবাদ বা ফলাফলসাপেক্ষবাদ (Consequentialism) বলে অভিহিত করা হয়। এই পরিণামবাদী নৈতিক মানদণ্ডগুলি একটি কাজকে ভালো বা যথোচিত বলে গণ্য করবে তখনই যদি দেখা যায় মন্দের তুলনায় অধিকতর ভালো উৎপাদনের ক্ষমতা কাজটির রয়েছে; অর্থাৎ কিনা যে ন-নৈতিক মূল্য সৃষ্টির কারণে কাজটিকে ভালো বলা হচ্ছে সেই সৃষ্ট ন-নৈতিক মূল্যের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অধিক। অপরাপর কর্ম বা নিয়ম যে পরিমাণ ন-নৈতিক মূল্য উৎপাদন করে সংশ্লিষ্ট কর্মটি তার তুলনায় অধিক পরিমাণ মূল্য সৃষ্টির কারণ হয় বলে সম্ভাব্য বিকল্প কর্মের তুলনায় সেই কর্মটিকে ভালো বা উচিত বলে

ছাড়পত্র দেয় উদ্দেশ্যবাদে। এই ন-নৈতিক মূল্যটি কি সে প্রশ্নে সকল উদ্দেশ্যবাদী একমত নয়; তা কারওর কাছে সুখ, কারওর কাছে সন্তোষ, কারোর কাছে উপযোগ, আবার কারোর মতে কল্যাণ বা পূর্ণতা। তবে কোনো কর্মের দ্বারা উৎপন্ন ফল বা ন-নৈতিক মূল্যের প্রকৃতি বিষয়ে পরিণামবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও পরিমাণগতভাবে অধিক হওয়ার কারণেই কোনো কাজকে তারা ভালো বা যথোচিত বলে দাবি করেন।

যে সকল উদ্দেশ্যবাদী মতবাদ পাশ্চাত্ত্য নীতিতত্ত্বে লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মতবাদ হল সুখবাদ। যারা সুখের মূল্যে কাজ বা নিয়মের ন্যায্যতা বিচার করেন তাদের বলা হয় সুখবাদী। এই সুখবাদীদের মধ্যে যেমন আত্মবাদীরা (Egoist) রয়েছেন তেমনি রয়েছেন পরবাদীরা (Altruist), যদিও এদের মধ্যে আত্মবাদেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই আত্মবাদীদের মতে মানুষ স্বভাবতই অহংকেন্দ্রিক এবং আত্মতৃপ্তি তার স্বাভাবিক কামনার বিষয়। তাই প্রত্যেক মানুষের একমাত্র কর্তব্য হল নিজের জন্য অধিকতম সুখ লাভের চেষ্টা করা। আর যে কাজ এই লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে তাই ভালো, তাই করণীয়; আর যে কাজ এই লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় হয় তাই মন্দ এবং তাজ্য।[১৫] কোনো কাজের ভালোত্ব-মন্দত্ব নির্ধারণের সময় অন্যের তাতে সুখ হল, নাকি দুঃখ তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না এই আত্মবাদীরা। কোনো কাজ করার ফলে কর্তাব্যক্তি কী পরিমাণ সুখ লাভে সমর্থ হচ্ছে সেটিই একমাত্র বিবেচ্য তার কাছে। সুখবাদীদের কেউ কেউ পরসুখ কামনার ঔচিত্য সমর্থন করেন ঠিকই, তবে কিনা আত্মপ্রসাদ লাভের উপায় হিসাবে সেই হিতৈষণাকে দেখেন তাঁরা। সকল সুখবাদী, তা তিনি আত্মবাদী হন বা পরবাদী, অহংপ্রীতিই সর্ববিধ

[১৫] *An Introduction to Ethics*, William Lillie, p.164.

কাজের মূল প্রেরণা— 'আত্মসিদ্ধিই একমাত্র চালিকাশক্তি'[১৬]। অ্যারিষ্টিপাস, এপিকিউরাস, হবস্ প্রমুখ দার্শনিকগণ আত্মসুখবাদের প্রচারক। সিজউইক আত্মসুখবাদের দুটি প্রকার উল্লেখ করেছেন— স্থূল বা অসংযত আত্মসুখবাদ (Gross egoistic hedonism) এবং মার্জিত বা সংযত আত্মসুখবাদ (Refined hedonism)। অ্যারিষ্টিপাস প্রচারিত সুখবাদ স্থূল আত্মসুখবাদ নামে পরিচিত। অপরদিকে গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস অ্যারিষ্টিপাসের স্থূল আত্মসুখবাদকে কিছুটা সংশোধন করে সংযত বা পরিচ্ছন্ন আত্ম সুখবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

এখন প্রশ্ন হল একজন সুখবাদীর বিচারে পরার্থে যেসকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয় সেই সকল কর্মের প্রণোদন কী হবে? সুখলিপ্সা যাকে কর্মে চালিত করে তিনি পরের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হবেন কেন? এর উত্তর দিতে গিয়ে আত্মসুখবাদীরা যে অবস্থান নেবেন তার খানিক পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। আত্মপ্রীতি যার সকল কর্মের চালিকাশক্তি পরার্থেকর্ম তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদেই তাকে অনেকক্ষেত্রে পরার্থপর হতে হয়। কারণ কোনো মানুষের পক্ষেই এককভাবে তার সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্ভব হয় না। এককভাবে মানুষ দুর্বল তাই বহুর মধ্যে, গোষ্ঠীর মধ্যে, সমাজের মধ্যে থেকেই আপন স্বার্থসিদ্ধি করতে হয় তাকে। যে সমাজ বা গোষ্ঠীতে মানুষ বাস করে সেই সমাজ রক্ষিত না হলে, মানুষের পক্ষে আত্মরক্ষা সম্ভব হয় না। তাই আত্মরক্ষার স্বার্থে সমাজরক্ষাকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে হয় তাকে। সমাজের নিয়ম, দেশের নিয়ম সকলের স্বার্থে রচিত। সেই নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তির মুখে পড়তে হয়। তাই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের পরহিতে কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

[১৬] *Ethics*, William K Frankena, p.20.

সুখের মানদণ্ডে সবকিছু বিচার করলেও আত্মসুখের সংকীর্ণ সীমায় আটকে থাকেন না পরসুখবাদীরা। যে সুখ একজন নৈতিক কর্তার ঈপ্সিত তা যে সবক্ষেত্রে আত্মসিদ্ধির মধ্য দিয়েই আসবে এটা পরসুখবাদীরা বিশ্বাস করেন না। অন্যের সুখেও মানুষ সুখী হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু পরসুখের কামনা কিভাবে আত্মবাদী মানুষের মধ্যে দেখা দেয়, এই বাধ্যতা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় কিভাবে, এইসব প্রশ্নের পরসুখবাদী ব্যাখ্যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

১.৩.৩ কান্টীয় কর্তব্যবাদ ও নৈতিক বাধ্যতার বিচারবাদী ব্যাখ্যা

কোনো কাজের ন্যায্যতা নির্ণয়ের সময় তার দ্বারা উৎপন্ন ফলাফলকে বিচারের মধ্যে রাখতে একান্ত নারাজ যে নৈতিক মতবাদ তাহল কর্তব্যবাদ। পরিণামবাদী নৈতিকতার একান্ত বিরোধী এই মতবাদ। এই মতানুযায়ী কর্মফল কখনোই কর্মের ভালোত্ব নির্ধারণের মাপকাঠি হতে পারে না। ব্যক্তির নিজের, পরিবার বা গোষ্ঠীর, এমনকি রাষ্ট্র বা সমগ্র মানব জাতির, মন্দের তুলনায় ভালো কোনো ফল উৎপাদন করছে কিনা তা বিচার করতে গররাজি কর্তব্যবাদীরা। তাদের বিচারে যেটি কর্তব্য, ভালো বা যথার্থ বলে গৃহীত হয়েছে তার সম্পাদনই কর্তব্য, তা সে যে ফলই উৎপন্ন করুক না কেন।

কর্তব্যবাদীদের মতে, ফলাফল নয় বরং তার নৈতিক প্রকৃতিই একটি কাজকে নায্য বা উচিত করে তোলে। তবে যেটি নায্য বা কর্তব্য সেটি কী কারণে নায্য বা কর্তব্য, তা বিচারের ক্ষেত্রে ঠিক কোন বিষয়টির বিবেচনা জরুরি— সেই প্রশ্নে কর্তব্যবাদীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। যারা কর্মকর্তব্যবাদী (Act Deontologists) তারা একটি কাজ করণীয় কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে পরিস্থিতিতে সেটি সম্পাদিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে চান। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ একজন ব্যক্তি একটি বিশেষ কর্ম

সম্পাদন করেন। ঔই ব্যক্তি ও তার পরিস্থিতি বিচার করেই সংশ্লিষ্ট কর্মটির সম্পাদন তার ক্ষেত্রে নায্য কিনা, তা নির্ধারণ করা উচিত বলে কর্মকর্তব্যবাদীরা মনে করেন। কোন সাধারণ নিয়মকে অভ্রান্ত ধরে নিয়ে নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির কর্তব্য ঠিক করার বিরোধী তারা। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি সর্বজনীন নিয়মকে অনুসরণ করে কর্তব্য নির্ধারণের পরিবর্তে পরিস্থিতি অনুসারে কোনটি কর্তব্য সেই সিদ্ধান্ত নিতে চান এরা। তবে কোনোক্ষেত্রেই পরিস্থিতি বিশেষে কর্মটি কী ফলপ্রসব করছে তা বিবেচনায় রাখেন না এরা।

এই পরিস্থিতিমূলক নীতিতত্ত্বের বিরোধিতা করেন নিয়ম কর্তব্যবাদীরা (Rule Deontologists)। এই মতানুযায়ী পরিস্থিতি যতই ভিন্ন ভিন্ন হোক তাদের মধ্যে একটি সামান্যতা থাকে। তাই এক বা একাধিক সাধারণ নিয়মের কাছে আবেদন রেখেই নৈতিক কর্তাকে কর্তব্য ঠিক করতে হয়। প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে কোনটি কর্তব্য তার বিচার বাস্তবসম্মত নয়। কারণ ওই বিচারের জন্য যে সময় ও সুযোগের প্রয়োজন, বাস্তবে তা নৈতিক কর্তার হাতে থাকে না। নিয়মানুসারে কর্তব্য নির্ধারণ করতে না পারলে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কর্মসম্পাদন ব্যাহত হবে। একথা ঠিকই যে কিছু ক্ষেত্রে একাধিক নিয়মের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। কিন্তু ওই দ্বন্দ্বের বিরোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নৈতিক কর্তাকে নিয়মেরই স্মরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং কর্তব্য নির্ধারণে নিয়মই সব।

এই ফলাফল নিরপেক্ষবাদী মনোভাব বাগ্ময় হয়ে উঠেছে যার দর্শনে তিনি হলেন জার্মান নীতিবিদ ইমানুয়েল কান্ট। কান্টের দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য বা ফলের নিরিখে কোন কর্মটি কর্তব্য বা করণীয় তা নির্ধারিত হয় না, হয় ব্যবহারিক প্রজ্ঞার (Practical Reason) আলোকে। তাঁর মতে বিচারশীল জীব হিসাবে প্রজ্ঞাই মানুষের পথপ্রদর্শক হতে পারে। এই

ব্যবহারিক বুদ্ধি যেহেতু মানুষের নিজস্ব, তাই নিজেই সে তার কর্মের নৈতিক মূল্য বিচার করতে পারে। এখানেই মানুষের স্বকীয়তা। কান্ট বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ব্যবহারিক বুদ্ধি, কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে নিঃশর্তভাবে কর্তব্য পালন করতে পারে। কিন্তু পার্থিব কামনা, বাসনা, আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা এগুলি আমাদের কর্তব্যপালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কান্ট মনে করেন মানুষ এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে তার বুদ্ধি থেকে উৎসারিত এক ইচ্ছার সাহায্যে, যাকে তিনি সদিচ্ছা বা Good will বলে অভিহিত করেছেন। এই সদিচ্ছার দ্বারা বিবেকের আদেশ নির্দেশ মেনে মানুষ যাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করবে তা ব্যবহারিক প্রজ্ঞার দ্বারা অনুমোদিত হবে। কান্টের মতে, এই জগতে কিংবা জগতের বাইরে সদিচ্ছা ব্যতীত এমন কোনোকিছুকে কল্পনা করা যায় না যা নিঃশর্তভাবে ভালো।[১৭]

সদিচ্ছা ও কর্তব্যবোধ দ্বারা প্রণীত যে বৌদ্ধিক সত্তা, সে যা করণীয় বলে নির্বাচন করে তা যে শুধু নিজের জন্যই নির্বাচন করে এমন নয়; বরং তা সে করে সমস্ত বিশ্ববাসীর এক প্রতিনিধি হিসাবে। সে যে নিয়ম অনুসারে কাজ করে সেই একই নিয়মে আপামোর জনসাধারণের পথ চলাতে সায় রয়েছে তার।[১৮] এই একই অবস্থায় সেই পথের পথিক সকলেই হোক এটা অন্তর থেকে চাইতে পারে যেকোন নৈতিক কর্মের কর্তা। ফলে চুরি করা মিথ্যা বলার মতো দুষ্কর্মকে সে যেমন অনুমোদন করতে পারে না তেমনই সেইসব কর্মকেও অনুমোদন করতে পারে না যেগুলি স্বার্থসর্বস্ব। এভাবে সদিচ্ছা সম্পন্ন বিবেকবান, কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ, প্রজ্ঞাশীল জীব হিসাবে মানুষকে উপস্থাপিত করে আত্ম-পরের ব্যবধান অতিক্রমের একটি মহতী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কান্টের নীতি দর্শনে।

---

[১৭] *Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals*, H. J. Paton, p. 61.

[১৮] *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, Immanuel Kant, p. 38.

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কান্টের এই নৈতিক আদর্শ যতখানি মহান, ঠিক ততখানি বাস্তবানুগ নয়। তিনি উপাদানবিহীন আকারসর্বস্ব এমন এক নীতি দর্শনের প্রস্তাব করেছেন যেখানে মানুষকে যাবতীয় আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, বাসনা, আনুভূতিশূন্য এক বিচারসর্বস্ব সত্তা হিসাবে দেখা হয়েছে। সকল রকম অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে কর্তব্যের প্রতি অনুগত থাকার যে আদর্শ, যাকে লিলি কৃচ্ছ্রতাবাদের আদর্শ বলেছেন[১৯]— তাতে স্বাধীন নির্বাচনের কতখানি অবকাশ রয়েছে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যায়। আর একইসঙ্গে এই ধরনের আদর্শকে অনুসরণ করা কতখানি নৈতিক সেই প্রশ্ন থেকে যায়। নৈতিকতা থেকে ভাবাবেগকে নির্বাসন দিলে নৈতিক জীবন দুঃসহ, শুষ্ক, কৃত্রিম জীবনাচারে পর্যবসিত হয়।

[১৯] *An Introduction to Ethics*, William Lillie, p.153.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় মিল-বেন্থামীয় উপযোগবাদ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় মিল-বেন্থামীয় উপযোগবাদ

২.১ উপযোগবাদের পটভূমি

ঊনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে ইংল্যান্ডের চিন্তার জগতে যে মতবাদ সর্বাধিক আলোড়ন ফেলেছিল সেটি হল উপযোগবাদ। ইন্দ্রিয়সর্বস্ব সুখবাদ এবং বিচারসর্বস্ব কর্তব্যবাদ এই দুই একদেশদর্শী মতবাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নৈতিক সুখবাদের এক নতুন রূপ আত্মপ্রকাশ করে যা উপযোগবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ শীতল আত্মপ্রীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে পরকল্যাণের উষ্মতাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়। কারণ ব্যক্তিগত সুখের নিরিখে কর্মপন্থা নির্ধারণ করলে সমাজ টেকে না। অন্যদিকে বিবেকের অনুশাসনে বিশুদ্ধ বুদ্ধির স্বচ্ছ আলোকে পথ চলার আহ্বানের মধ্যে উত্তুঙ্গ আদর্শকে স্পর্শ করার মরিয়া প্রয়াস থাকলেও আবেগ অনুভূতির পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা, দোষে গুণে ভরা মানুষের পক্ষে সে চেষ্টা কতখানি সফল হবে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'সুখই মানব জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ' – এই দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা নতুন নয়। প্রাচীন গ্রীক চিন্তাবিদ সাইরেনাসের (Cyrenaics) চিন্তাতেও এই ভাবনার পরিচয় পায়। এমনকি তাঁর পূর্বেও মানব ইতিহাসে এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে দর্শন ও সাহিত্যে এই মতবাদই সুখবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। উপযোগবাদ এই সুখবাদেরই উত্তরসূরি। সুখই উত্তম বা মানুষের জীবনের আদর্শ এই চিন্তা সুখবাদ থেকেই লাভ করেছেন উপযোগবাদীরা। যে ইংরেজি শব্দ 'Hedonism' থেকে বাংলা 'সুখবাদ' শব্দটির উৎপত্তি সেটি গ্রীক শব্দ 'Hedone'

থেকে এসেছে।[১] 'Hedone' শব্দটির ইংরেজি অর্থ 'Pleasure' যাকে বাংলায় ইন্দ্রিয়তুষ্টি বলা চলে। সুখবাদ মনে করে যে, মানুষের প্রকৃতিই এমন যে সে সুখ চায়। তার মানসিক গঠনের মধ্যে যেমন ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ঝোঁক রয়েছে তেমনি সেই মানসিক প্রবণতাকে নৈতিক ক্ষেত্রে মান্যতা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন সুখবাদীরা। আমাদের মন যা চায় তা অনুযায়ী আমাদের চালিত হওয়া উচিত। তাই সুখ লাভই মানব জীবনের পরম আদর্শ। যে মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদের উপর নৈতিক সুখবাদ দাঁড়িয়ে আছে সেই মনস্তাত্ত্বিক সুখবাদ হিউম, বেন্থাম, মিল ও বেইনের মত কোন কোন দার্শনিক সমর্থন করেন। তবে এরও বহু আগে বিশিষ্ট চৈনিক চিন্তাবিদ, মো-তজু (Mo-Tzu) এর মধ্যে সুখবাদের সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। ঠিক কোন সময়ে এবং কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা জানা না গেলেও প্রাচীন চীনে এই চিন্তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ইংরেজী 'Utilitarianism' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল 'উপযোগবাদ'। যা সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শ প্রচার করে। সাধারণভাবে বেন্থামকে উপযোগবাদের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। কিন্তু ১৬৭২ সালে রিচার্ড কাম্বারল্যান্ড তাঁর '*De Legibus Naturae*' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম সর্বাধিক মঙ্গল বা কল্যাণের ধারণাটি ব্যক্ত করেন। তিনি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, সর্বাধিক মঙ্গল বা কল্যাণের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন মহান স্রষ্টা নিজেই। পরবর্তীকালে জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) কাম্বারল্যান্ডের রচনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং 'An Introduction to the Principles of Morals and Legislation' গ্রন্থে 'Utilitarianism' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর পূর্বে এই শব্দটি আর কেউ ব্যবহার করেনি। তাই বেন্থামকে উপযোগবাদের প্রবক্তা হিসেবে

[১] Moore, Andrew. 'Hedonism', The Standford Encyclopedia of Philosophy, Fall 20 Arp 2004. https://plato.stanford.edu/entries/hedonism/ (Visited on: 20.01.2024)

গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে দুজন ব্রিটিশ দার্শনিক যথাক্রমে জেমস মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) হাত ধরে এই মতবাদ পরিবর্ধিত, বিকশিত ও পরিপূর্ণতা পায়। পরবর্তীকালে হেনরি সিজউইক, ম্যুর প্রমুখ এই উপযোগবাদী পরম্পরাকে বহন করে নিয়ে যান।

২.২ উপযোগবাদের পরিচয়

উপযোগবাদ হল একটি ফলাফলবাদী বা উদ্দেশ্যবাদী মতবাদ, যা কর্তব্যবাদ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কর্তব্যবাদ ফলাফলকে বিচারে না রেখে একটি কর্ম বা নিয়মের নৈতিক প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে ফলাফলবাদ মন্দের তুলনায় একটি কর্ম সর্বাধিক কি পরিমাণ ভালো-কে উৎপন্ন করতে পারছে তা বিবেচনা করে দেখে। এই ভালোর সাথে নৈতিকতার কোনো সম্বন্ধ নেই বরং তা ন-নৈতিক মূল্য স্বরূপ। কোথাও তা সুখ, কোথাও উপযোগিতা, কোথাও অন্যকিছু। তবে, উপযোগবাদের সংজ্ঞা দেওয়া একটি সমস্যার ব্যাপার। এর একটি কারণ যদি হয় এর নানা রূপ ও তাদের জটিলতা তা হলে আরেকটি কারণ হল উপযোগবাদী ভাবধারার ব্যপকতা। এটি যে শুধু একধরণের দার্শনিক মতবাদকে সূচিত করে তা নয়, এর দ্বারা মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গিগত একটি ধারণাকেও বোঝায়। কেউ যখন খুব বাস্তববাদী হয় এবং প্রয়োজন পূরণে সফল হয় কিংবা ওই ধরনের মনোভাব সমর্থন করে; দৈনন্দিন জীবনে তাকেও আমরা উপযোগবাদী বলে অভিহিত করি।

সাধারণভাবে বলা যায় উপযোগবাদ হল এমন একটি মতবাদ যেখানে সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক হিত উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই হিত আসলে সুখ বা ইন্দ্রিয়তুষ্টির নামান্তর। তবে উপযোগবাদীদের মতে আত্মসুখ নয়, সর্বসাধারণের

হিতসাধনই হল নৈতিক জীবনের আদর্শ এবং তদনুসারে কর্মনীতি প্রস্তুত করা কাম্য। এই উপযোগবাদীরা যেহেতু শুধু আপন সুখ বা স্বার্থের কথা চিন্তা করে না, পরহিতের কথা চিন্তা করে এবং কোন কাজ বা নিয়ম অপরের হিতসাধন করবে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, তাই এককথায় আমরা এদের হিতবাদী বলতে পারি। অধিকাংশ হিতবাদী অন্যের হিত বলতে বোঝেন অন্যের সুখকে। তবে ম্যূরের মতো কোনো কোনো ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ আছেন যারা হিতবাদী হলেও সুখবাদী নয়। সে যাই হোক ইউটিলিটারিয়ানরা সুখবাদীই হোন আর অ-সুখবাদীই হোন যেহেতু পরহিতের কথা বিবেচনায় রেখে কার্য সম্পাদনের উপদেশ করেন তাই এদের আমরা এককথায় হিতবাদী বলতে পারি।

হিতের উপর গুরুত্ব দেওয়া, তার পরিমাণ পরিমাপের ব্যবস্থা করা এবং তার সর্বাধিকীকরণের পথ অনুসন্ধান করার চেষ্টা প্লেটোর প্রোটাগোরাস চরিত্রের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত সৎ গুণই যে এক, সেকথা প্রমাণ করতে গিয়ে সক্রেটিস হিতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে সুখবাদকে সমর্থন করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, যেসব মানসিক অবস্থা সুখদায়ক কেবল সেগুলিই মূল্যবান। অন্য ভাষায় বলা যায়, সেগুলি এই কারণে মূল্যবান যে, সেগুলি সুখদায়ক। কেউ কেউ গ্রীক নীতিতত্ত্বকে মুখ্যত আত্মবাদী বলে মনে করেন, যেখানে একজন ব্যক্তি তার কল্যাণ বা হিতের জন্য কী করবে সেই জিজ্ঞাসার নিদান দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু উপযোগবাদ একটি ব্যক্তি নিরপেক্ষ মতবাদ। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের অনুগামী স্টোয়িক সম্প্রদায় একধরনের ব্যক্তিনিরপেক্ষতা অনুশীলন করতেন; যেখানে এক বিচারশীল মন থেকে অন্যদের এমনকি বাইরের লোকেদেরও কল্যাণ বা হিত চিন্তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। আত্মত্যাগের খ্রীস্টীয় আদর্শের সঙ্গেও কিছু অংশে এই মতবাদের মিল রয়েছে। সেই থেকেই নৈর্ব্যক্তিক উপযোগিতার ধারণাটি

ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে পুনঃজাগরণের হাত ধরে এই নৈর্ব্যক্তিক হিতের ধারণাটিই উপযোগবাদ নামে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

এই হিতবাদের ভিত্তি হল উপযোগিতার নীতি। যার দ্বারা বেশিরভাগ মানুষের জন্য বেশি মাত্রায় সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ সুবিধার নিশ্চিতকরণ করা হয়। এই মতবাদ অনুসারে যে কাজ সর্বসাধারণের সুখ উৎপাদনে উপযোগী সে কাজ যথাযথ বা ভাল। আর যে কাজ এরূপ সুখ উৎপাদনে উপযোগী নয়, তা অনুচিত বা মন্দ। সুতরাং উপযোগিতা বা কার্যকারিতাই হল নৈতিক বিচারের একমাত্র মানদণ্ড। তত্ত্বগত দিক থেকে অধিকাংশ উপযোগবাদীর দাবি দুটি। প্রথমত, কোনো কাজ করার বা কোনো নিয়ম নির্বাচন করার সময় সেই কাজ বা নিয়ম হিত বা উপযোগ সৃষ্টি করছে কিনা সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। অর্থাৎ উপযোগের কাছে আবেদন রেখেই কাজের ন্যায্যতা বিচার করতে হবে। এই উপযোগ কার্যত ইন্দ্রিয় সুখেরই নামান্তর। আর দ্বিতীয়টি, যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, হল এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, ঐ কাজটি করার ফলে বা ঐ নিয়ম অনুসরণের ফলে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ ঘটেছে কিনা। 'Greatest good of the greatest number' এটিকে হিতবাদের মূলমন্ত্র বলা চলে।

উপযোগবাদ একটি মানব কল্যাণমূলক নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে এই মতবাদের সূত্রপাত ঘটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে এই মতবাদ বেশ প্রসার লাভ করে। উপযোগবাদ অনুসারে সর্বাধিক সুখ লাভই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন সেই মতই গ্রহণযোগ্য হয় যা সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সমর্থিত, তেমনি এই ধরণের নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সেই কাজকেই আমরা নীতিসম্মত বলব, যা

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। অপরের সুখের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজের সুখের কথা ভাবলে, নিজের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ সুখ লাভ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। কারণ যে মানুষ অপরের সুখের কথা চিন্তা করেনা, সে অপরের কাছ থেকে কোন সুখের আশা করতে পারেনা। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের সুখের জন্য অপরের সাহায্য বা সহানুভূতি প্রত্যাশা করে। মানুষ নিজের সাথে সাথে সর্বাধিকজনের মঙ্গলও কামনা করে। কারণ উপযোগবাদ অনুসারে, সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তি কল্যাণ নিহিত। জনকল্যাণের কথা চিন্তা না করলে ব্যক্তিগত কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। তবে ইউটিলিটিতত্ত্ব অনুযায়ী যে কোনো কল্যাণই নির্ধারিত হবে উপযোগিতা নীতির মাধ্যমে।

২.৩ উপযোগবাদের নানা প্রকার

সাধারণত পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের দুটি রূপের কথা বলা হয়, একটি স্থূল(Gross), অন্যটি সংযত বা পরিশীলিত (Sophisticated)। এই দুই ধরনের বিভাজনের সঙ্গে ঐতিহাসিক ভাবে জড়িয়ে রয়েছে জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের নাম। উভয়েই পরসুখবাদী। কিন্তু সেই সুখের প্রকৃতি ঠিক কেমন হবে, কোন ধরনের সুখের আধিক্য ঘটাতে পারলে কোনো কাজ বা নিয়ম ভালো হবে সেই প্রশ্নে এই দুই দার্শনিক ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বেন্থামের বিশ্বাস পরিমাণগত ভাবে অধিক সুখই মানুষের ঈপ্সিত। তাঁর মতে নানা সুখের মধ্যে যে তারতম্য তা কেবল মাত্রাগত, উৎকর্ষগত বা গুণগত নয়। যদি মাত্রাগত ভাবে দুটি সমান সুখকর হয় তাহলে পিনের খোঁচার সঙ্গে কাব্য পাঠের আনন্দের কোনো তফাৎ করতে রাজি নন বেন্থাম।[২] এ রকম অবস্থান আবার একেবারেই মনঃপুত নয় মিলের। নানা সুখের মধ্যেই উৎকর্ষগত তফাত যে রয়েছে সেটা মেনে নেন মিল। আর যে সুখের

[২] *Introduction to Ethics*, Frank Thilly, p. 168.

উৎকর্ষ বেশি তাই তাঁর মতে ঈপ্সিত। যেহেতু নানা সুখের মধ্যে কোন গুণগত ভেদ বেন্থাম স্বীকার করেন না তাই তাঁর হিতবাদ স্থূল বা অসংযত। আর নানা সুখের মধ্যে গুণগত তফাতটিকে মেনে নেন বলে মিলের অবস্থানকে সংযত বা পরিশীলিত উপযোগবাদ বলা হয়।

উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে উপযোগবাদের ত্রিমাত্রিক বিভাজন প্রস্তাব করেন— কর্মনিষ্ঠ উপযোগবাদ (Act Utilitarianism), নীতিনিষ্ঠ উপযোগবাদ (Rule Utilitarianism), এবং সাধারণ উপযোগবাদ (General Utilitarianism)।[৩] কর্মনিষ্ঠ উপযোগবাদে কর্মেরই প্রাধান্য। উপযোগবাদের এই রূপটি যারা সমর্থন করেন তারা কোনো নিয়ম বা চিরাচরিত পথ মেনে কোনো কাজের ন্যায্যতা বিচার করতে রাজি নন। 'আমার কোনটা করা উচিত হবে?'- এরকম প্রশ্নের মখোমুখি হয়ে কর্মনিষ্ঠ একজন উপযোগবাদী বিচার করে দেখেন যে বিশেষ দেশে, বিশেষ কালে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি রয়েছেন সেই দেশ, কাল ও পরিস্থিতিতে কোন কাজটা করলে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক হিত হবে। আমরা জানি "সত্য কথা বলা সাধারণতঃ সকলের ভালোর জন্য", কিন্তু এক্ষেত্রে একজন কর্মনিষ্ঠ উপযোগবাদী বিচার করে দেখবেন যে, এই পরিস্থিতিতে সত্য বললে সকলের সর্বাধিক কল্যাণ হবে কিনা।

একদল উপযোগবাদী আছেন যারা স্থান, কাল, পরিস্থিতি বিচার করে প্রতিনিয়ত আপন কর্তব্য নির্ধারণের একান্ত বিরোধী। তাদের মতে এই বিচার সময় সাপেক্ষ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিচারপূর্বক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক কর্মে প্রবৃত্ত হতে গেলে কর্মনাশ তথা সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা। তার তুলনায় অনেক সহজ ও কার্যকরী পদক্ষেপ

[৩] *Ethics* (2nd ed.), William K Frankena, p. 35.

হল সাধারণ নিয়মের কাছে আবেদন রেখে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করা। একথা ঠিক যে সবক্ষেত্রে একটাই নিয়ম কর্মকর্তার কাছে আসে না। এমন একাধিক নিয়ম কর্মকর্তার কাছে হাজির হতে পারে, যাদের মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু দ্বন্দ্ব থাকলেও সেই নিয়মের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায় এবং ব্যাপকতর একটা নিয়মের কাছে আবেদন রেখেই সেটা করা যায়। মোটকথা নিয়মনিষ্ঠ হয়েই নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করতে চান এই উপযোগবাদীরা। তাই এদের নিয়মনিষ্ঠ উপযোগবাদী বলা চলে। নিয়মনিষ্ঠ উপযোগবাদের তিনটি রূপ— আদি নীতি উপযোগবাদ (primitive-rule-utilitarianism), বাস্তব নীতি উপযোগবাদ (actual- rule-utilitarianism), আদর্শ নীতি উপযোগবাদ (ideal- rule-utilitarianism)।[৪]

ফ্রাঙ্কেনা কথিত সাধারণ উপযোগবাদের একজন অনুগামী কর্তব্য নির্ধারণের একটা বিকল্প পথের হদিস দেন আমাদের। তিনি মনে করেন কোনটা সর্বাধিক মানুষের পক্ষে সর্বাধিক হিতকর সেটা বুঝে নেওয়ারও একটা সহজ উপায় আছে। মনে মনে একবার বিবেচনা করে দেখতে হবে আমি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করছি সেই কর্ম বা সেই পন্থা যদি সকলেই গ্রহণ করে তাহলে তার পরিণতি কী হবে? সাধারণ উপযোগবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক পরিস্থিতিতে কোন কাজ সবচেয়ে ভালো ফল উৎপন্ন করে সে প্রশ্ন নিরর্থক। "সবাই যদি এক্ষেত্রে এরকম করে, তাহলে কি হবে?"- সাধারণ উপযোগবাদীরা এরকম প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সাধারণ উপযোগবাদ অনুযায়ী কোনও কাজ যদি একটি পরিবেশে একজনের জন্য ভালো হয়, তাহলে অন্য কেউ একই পরিবেশে একই কাজ করলে ভালো হবে।

[৪] Ibid, p. 40.

উপযোগবাদের একটি শাখা আছে যেটি সুখবাদের পথ পরিত্যাগ করে। এই অ-সুখবাদী উপযোগবাদের প্রবর্তক হলেন জি ম্যূর। ১৯১২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে ম্যূর এমন এক প্রকার উপযোগবাদ প্রচার করেন যা বিশুদ্ধ সুখবাদী পরবাদের পরিপন্থী। ম্যূর দেখান সুখ ভালোত্ব নির্ধারণের মানদণ্ড হতে পারে না, বরং এমন এক ধরনের মূল্য আছে যাকে সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করার আশা আমরা করতে পারি। সুখবাদীরা ধরে নেন যে, জগতে সুখ ছাড়া আর কিছু নেই- জ্ঞান, সৌন্দর্য, নান্দনিক বোধ, নৈতিক গুণ কোনো কিছুই নেই। কিন্তু ম্যূর মনে করেন উল্লিখিত মূল্যগুলির সমন্বয়ে যে জগত তৈরি হবে তা অনেক বেশি মূল্য প্রদায়ক জগৎ হবে। যে জগতে সুখ আছে তার তুলনায় যে জগতে সুখের পাশাপাশি জ্ঞান, ভালোবাসা, নান্দনিক বোধ, মূল্যবোধ এসব রয়েছে তা অনেক বেশি পরিমাণে হিত সৃষ্টি করে বলে ম্যূর মনে করেন। কাজেই তিনি শুধুমাত্র সর্বাধিক সুখ সৃষ্টিকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করেননি। যদিও সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক ভালোর (যে ভালোর সঙ্গে সুখ ছাড়াও অনেক কিছু মিশে রয়েছে) উপযোগবাদী মানদণ্ডে আস্থা রয়েছে তাঁর। বস্তুত সুখের গুরুত্ব যে রয়েছে সেটা পুরোপুরি অস্বীকার করেন না ম্যূর। কিন্তু যে জগতে শুধুই সুখ আছে তার তুলনায় যে জগতে সমপরিমাণ সুখের সঙ্গে জ্ঞান আহরণ, সৌন্দর্য বিলাস, নৈতিকতা এসব রয়েছে তা প্রথম জগতের তুলনায় অবশ্যই শ্রেয় বলে মনে হয়েছে ম্যূরের।

কার্ল পপার উপযোগবাদের একটি নঞর্থক আকারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই ধরনের উপযোগবাদ আমাদের কাছে আহ্বান জানায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের যাতে সবচেয়ে কম পরিমাণ কষ্ট হয় তাঁর দিকে নজর দিতে। এই মতবাদ সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখের দাবি না রেখে সর্বাধিক মানুষের স্বল্পতম কষ্টের ব্যবস্থার প্রতি আবেদন রাখে। উপযোগবাদের অন্যান্য রূপের সাথে এর তফাত এখানে

যে, সর্বাধিক বৃদ্ধির চিরাচরিত ধারণাকে সর্বাধিক হ্রাসের ধারণা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। এই মতবাদের সমর্থকদের বক্তব্য হল, সুখ বৃদ্ধির তুলনায় কষ্ট বৃদ্ধির ব্যাপারটি অধিকতম গুরুত্বপূর্ণ। এতএব কোনো কাজ বা নিয়মের নৈতিক মূল্যায়নের সময় সেটি কতখানি দুঃখ কষ্টের আধিক্য ঘটাচ্ছে সেই ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখা উচিত।

২.৪ জেরেমি বেন্থাম ও নৈতিক বাধ্যতার উপযোগবাদী ব্যাখ্যা

জেরেমি বেন্থাম ১৭৪৮ সালে লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো ছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সে তিনি ল্যাতিন ও ইংরেজিতে লেখা ইতিহাসের গ্রন্থ পড়ে ফেলেছিলেন। ছয় বছর বয়সে তিনি ল্যাতিন ভাষা লিখতে পারতেন এবং সাত বছর বয়সে এই ভাষায় কবিতা লিখতেন। পনের বছর বয়সে তিনি ডিগ্রিলাভ করেন এবং বাবার ইচ্ছানুসারে আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইন ব্যবসা তিনি করেননি। আইনবিদের পেশা ছেড়ে তিনি আবার পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। পরবর্তীতে তিনি আইন ও প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের ব্যাপারে নিজের দেশ ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সরকারকে পরামর্শ দিতেন। ১৭৭৬ সালে বেন্থামের বিখ্যাত রচনা ‘Fragment of Government’ প্রকাশিত হয়। ১৭৮০ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত ‘An Introduction to the Principles of Morals and Legislation’ গ্রন্থে উপযোগবাদকে একটি সুসংবদ্ধ মতবাদ রূপে উপস্থাপিত করেন।

ব্যক্তির নীতিবোধ, মূল্যবোধ এবং যুক্তিবোধকে সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া বেন্থামের হিতবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। উপযোগবাদ আদর্শের তুলনায় বাস্তবকে বেশি প্রাধান্য দেয়। তাই বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রতিটি বিষয় যাচাই করার প্রস্তাব রাখে এই মতবাদ। ব্যক্তির সুখানুসন্ধানকে উদ্দীপিত করা ও মোট সুখের পরিমাণ বাড়িয়ে

তোলা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। উপযোগবাদ মানুষকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন একক বলে মনে করে না। সমাজের অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক নাগরিকের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান যে আইন বা সিদ্ধান্ত করতে পারবে তাকেই মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ, উপযোগ হবে যে কোনো বিষয়ের গ্রহণ বা বর্জনের নির্ধারক। উপযোগিতা যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে নাগরিক তা বর্জন করতে পারবে। এই উপযোগিতার মাপকাঠিতে সমাজের যাবতীয় বিষয় বিচার করতে হবে।

মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের উপর ভিত্তি করে জেরেমি বেন্থাম তাঁর উপযোগবাদী তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃতি আমাদের সুখ এবং দুঃখ নামক দুই সার্বভৌম প্রভুর অধীনস্ত করেছেন।[৫] তাই প্রতিটি মানুষ নিজের জন্য অধিকতম সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় এবং দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করে। মানুষের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের মূলে আছে তার নিজের সুখ প্রাপ্তির তাগিদ। তিনি উপযোগবাদের নীতিটি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন—

> By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have to argument or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness.[৬]

অর্থাৎ বেন্থামের মতে, উপযোগিতার নীতি বলতে বোঝায় সেই নীতিকে যা কোনো কাজকে অনুমোদন করে বা অননুমোদন করে, যে প্রবণতা অনুসারে এটি যুক্তি দেখাতে পারে যে

---

[৫] "Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, *pain* and *pleasure*." — Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, p.1.

[৬] Ibid, p.2.

কারো যদি কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাতে অনুমোদন দেওয়া হয় তখনই, যখন সুখের মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে। তাঁর মতে, একটি কাজের উপযোগিতা আছে বলে মনে করা হবে যদি সেই কাজটি বহু উপকার, আনন্দ, কল্যাণ বা সুখ সুনিশ্চিত করতে পারে ও একই সঙ্গে কষ্ট যন্ত্রণা বেদনা এবং অপকার থেকে ব্যক্তিকে রেহাই দিতে পারে।

উপযোগিতা বলতে বেন্থাম কী বুঝিয়েছেন তা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness, or to prevent the happening of mischief, pain, evil, or unhappiness to the party whose interest is considered: if that party be the community in general, then the happiness of the community: if a particular individual, then the happiness of that individual.[৭]

বেন্থাম সুখের সাথে সংযম, চরিত্র, ন্যায়বিচার ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে এগুলির কোন স্বগতমূল্য নেই। এই গুণগুলি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে যদি এগুলি সুখ লাভে বা সুখবৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সুতরাং বেন্থামের মতে, সুখের উৎপত্তি বা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এমন প্রতিটি কাজই ভালো। আর সুখের উৎপত্তি বা বৃদ্ধিতে বাধা দেয় এমন প্রতিটি কাজই মন্দ। যে কাজ যত বেশি সুখ উৎপন্ন করে সে কাজ তত বেশী ভালো। কিন্তু প্রশ্ন হল সুখের কম বেশি বুঝব কি করে? বেন্থামের মতে সুখের মাপনি হল সুখের পরিমাণ। গুণগতভাবে সব সুখ অভিন্ন। একটি দৈহিক সুখকে একটি মানসিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলা যায় না। দুটি সুখের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে সুখ দুটির পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। সুখের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য

[৭] Ibid.

বেন্থাম তাঁর 'Principles of Morals and Legislation' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সুখ-কলন বা Hedonistic Calculas[৮] নামে এক বিশেষ পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই পদ্ধতি অনুসারে তীব্রতা (intensity), স্থিতিকাল (duration), নিশ্চয়তা (certainty), নৈকট্য (propinquity), বিশুদ্ধতা (purity), উর্বরতা (fecundity), এবং বিস্তৃতি (extent)— এই সাতটি ধর্মের দ্বারা সুখের পরিমাণ বা মাত্রা নির্ণয় করা যায়। বেন্থাম মানুষের ব্যক্তিগত সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে নিয়েও সর্বাধিক মানুষের জন্য অধিকতম সুখের আদর্শ প্রচার করেছেন। তাঁর মতে এই আদর্শের পথে যে কাজ বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই কাজের কোনো মহত্ব নেই।

বেন্থাম যদিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী ছিলেন তবুও এমন কথা বলা যায় না যে তিনি সমাজে সামগ্রিক স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছিলেন। উভয়ের মধ্যে যে বিরোধ থাকতে পারে সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় স্বার্থের মধ্যে যে বিরোধ আছে তার মাত্রা কীভাবে কমিয়ে ফেলা যায় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেন্থাম বলেছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা পেলে ও সমাজ সম্পর্কে নাগরিক সচেতন হলে ব্যক্তি নিজের সুখ ও আনন্দের সঙ্গে সমাজের সুখ ও আনন্দকে যুক্ত করে নেবে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটা চলনসই ও কল্যাণজনক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষিত মানুষ একেবারে স্বার্থপর হয় না। তা যদি হত তাহলে সমাজ অচল হয়ে পড়ত। তার মতে গণমুখী শিক্ষাই ব্যক্তিস্বার্থ ও সামগ্রিক স্বার্থের মধ্যে একটি সেতু রচনা করে। তাই এই জাতীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

[৮] Ibid, p. 151.

২.৫ নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় জন স্টুয়ার্ট মিল

পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ একটি পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে মিলের রচনার মধ্য দিয়ে। তিনি সুখের ধারণাকে আনন্দের ধারণার মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল বেন্থামের উপযোগবাদকে আপাতঃদৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষত সর্বাধিক সুখতত্ত্বকে তিনিও স্বীকার করেছেন। 1863 সালে প্রকাশিত 'Utilitarianism' গ্রন্থে তিনি উপযোগবাদের নীতিটি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন—

> "The creed which accepts as the foundation of morals, utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure."[৯]

মিলের মতে কাজগুলি যে অনুপাতে আনন্দ সৃষ্টিতে প্রবণ সে অনুপাতে সেগুলি যথোচিত, আর যে অনুপাতে কাজগুলি আনন্দের বিপরীত অনুভব উৎপাদনে প্রবণ সে অনুপাতে সেগুলি অনুচিত। তিনি আনন্দ বলতে বুঝিয়েছেন সুখের উপস্থিতি এবং দুঃখের অভাব; আর আনন্দহীনতার অর্থ হল দুঃখের উপস্থিতি এবং সুখের অভাব। অর্থাৎ মিলের মতে কাজের ঔচিত্য- অনৌচিত্য অনুপাত ভিত্তিক।

মিল Utility শব্দটিকে Happiness শব্দের সাথে সমার্থক বলেছেন। তাঁর মতে উপযোগিতা ও আনন্দ একই। মিল আনন্দসৃষ্টিরূপ প্রবণতাকেই কোনো কাজের উপযোগিতা বলেছেন। তাঁর মতে যে কাজ দুঃখের তুলনায় অধিক আনন্দ বর্ধনে উপযোগী সেই কাজই সঠিক বা ভালো। মানুষের জীবনের পরম কাম্য বস্তু মিলের দৃষ্টিতে দুটি—

[৯] *Utilitarianism*. Jhon Stuart Mill, p. 55.

সুখলাভ ও দুঃখমুক্তি। কিন্তু মানুষ যশ, অর্থ, স্বাস্থ্য ইত্যাদিও কামনা করে। তবে এগুলি সুখ লাভের বা দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবেই কাম্যবস্তু। মিলের ভাষায়—

> …pleasure, and freedom from pain, are the only things desirable as ends; and that all desirable things (which are as numerous in the utilitarian as in any other scheme) are desirable either for the pleasure inherent in themselves, or as means to promotion of pleasure and the prevention of pain.[10]

দুটি সুখের মধ্যে কোনটি কাম্য সে প্রশ্নের উত্তরে বেন্থাম পরিমাণকেই একমাত্র মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ক্ষেত্র বিশেষে মানসিক সুখের উৎকর্ষ স্বীকার করলেও দৈহিক সুখ ও মানসিক সুখের মধ্যে কোন গুণগত তারতম্য স্বীকার করেননি। কিন্তু মিল পরিমাণ ছাড়াও গুণকে সুখের মানদণ্ড হিসাবে স্বীকার করেছেন। দৈহিক সুখ ও মানসিক সুখের গুণগত তারতম্য মেনেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য- "It is better to be human being dissatisfied than a fool satisfied, better to be Socrates dissatisfied than a pig satisfied."[১১] মিল স্পষ্টতই উচ্চতর সুখ বলতে উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি তথা মানসিক শান্তিকে বুঝিয়েছেন। এই উচ্চতর সুখ বা আনন্দের পরিমাপ কীভাবে হবে সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দুটি সুখের মধ্যে যদি একটি সুখ এমন হয় যা পছন্দ করতে নৈতিক বাধ্যবাধকতার অনুভূতি উল্লেখ না করে উভয়ের সম্পর্কের অবহিত সবই বা প্রায় সবাই একটি সুখের প্রতি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, তা হলে সেটাই হবে অধিকতর কাম্য সুখ।

প্রসঙ্গত বলা যায় সুখ-দুঃখের মধ্যে গুণগত পার্থক্য স্বীকার করার ফলে মিল সুখবাদের মূল ধারা থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। পরিমাণের বিচারে সমান দুটি

---

[10] Ibid.

[১১] Ibid, p. 57.

সুখের মধ্যে একটি সুখ কেবল গুণগত তারতম্যের কারণে অপরটির অপেক্ষা উচ্চ সুখ হিসাবে বিবেচিত হয়। তাই এক্ষেত্রে সুখকে আর স্বতন্ত্র স্বস্থিত মূল্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। সুতরাং আমাদের সুখের অতিরিক্ত অন্য কোনো গুণের কথা চিন্তা করতে হয়। মিলের মতে মানুষ নিজের সুখ বা কল্যাণের পাশাপাশি সে অন্যের কল্যাণও কামনা করে। তিনি মনে করেন নিছক সুখ বা আনন্দের মোহে মানুষ সব সময় পরিচালিত হয় না। নীতি ও আদর্শ বোধের বিচারে মানুষ গ্রহণ ও বর্জন পদ্ধতি অবলম্বন করে, শুধু সুখ প্রদানের ক্ষমতা বা অক্ষমতা তার কাছে একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়। মিল তাঁর তত্ত্বকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের গণ্ডী থেকে বের করে নিয়ে সমাজের বহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর কাছে ব্যক্তি অনেকখানি পরার্থপর হয়ে গিয়েছে। নিজ কল্যাণের চেয়ে সে অন্যের হিত অধিকতর উৎসাহ সহকারে বিচারবিবেচনা করে। মিল যদিও রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষপাতী তবুও সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের প্রয়োজনে রাষ্ট্র ব্যক্তির কাজকর্ম ও অর্থ বণ্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

প্রশ্ন থেকে যায় পরসুখের এই ভাবনা ব্যক্তির মধ্যে আসে কীভাবে? সুখ লাভই যার উদ্দেশ্য আপন সুখের জন্য কাতর না হয়ে পরসুখের ভাবনায় ভাবিত হওয়ার বাধ্যতাবোধ তার মধ্যে জন্ম নেয় কোন পরিস্থিতিতে? পরকল্যাণের এই ভাবনা মানুষের মধ্যে কীভাবে জন্ম নেয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জেরেমি বেন্থাম চার প্রকার বাহ্য নিয়ন্ত্রণ বা External Sanction[১২]-এর কথা বলেছেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক

[১২] *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation,* Jeremy Bentham, p.147.

এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এই চতুর্বিধ নিয়মের অধীন মানুষ। এই চারটি নিয়ন্ত্রণের প্রভাবেই স্বভাব স্বার্থপর মানুষ অন্যের সুখ কামনা করে।

তবে শুধুমাত্র বাহ্য নিয়ন্ত্রণের প্রভাবে মানুষ পরার্থপর হতে বাধ্য হয় এরকমটা মেনে নেওয়া মুশকিল। নিয়মকে মান্য করার অন্তরের তাগিদ না থাকলে যেমন শুধুমাত্র ক্ষমতার বলে কোন নিয়মকে একদল মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনই শুধুমাত্র বাহ্য হস্তক্ষেপের ভয়ে জন্মগত ভাবে স্বার্থপর যে মানুষ সে রাতারাতি পরার্থপর হয়ে উঠবে এমনটা ভাবা এক জটিল ঘটনার অতি সরলীকরণ বলে মনে হয়। হয়তো এই উপলব্ধি থেকেই জন স্টুয়ার্ট মিল বহির্নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে অন্তর নিয়ন্ত্রণ বা internal sanction-এর প্রস্তাব করেছেন[১৩]। তিনি মানব মনের গহনে থাকা এক 'Conscientious feelings'[১৪]- কে স্বীকার করেছেন যা ব্যক্তির কাছে অন্যের মঙ্গল কামনার এক আন্তর তাগিদ হয়ে দাঁড়ায়।

[১৩] *Utilitarianism*. Jhon Stuart Mill, p. 77.

[১৪] Ibid, p. 76.

তৃতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গ মানসে উপযোগবাদের প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের বঙ্গ মানসে উপযোগবাদের প্রভাব

৩.১ বঙ্গসমাজ ও উপযোগবাদী ভাবনার পটভূমি

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ইউরোপীয় চিন্তা ও চেতনাকে যে সকল নৈতিক মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তাদের মধ্যে ইউটিলিটি তত্ত্ব অন্যতম। একদিকে অত্মসুখের স্থূলতত্ত্ব এবং অন্যদিকে বিচারসর্বস্ব নিষ্প্রাণ শুষ্ক নৈতিকতার কর্তব্যবাদী তত্ত্ব কোনটিই মনস্ক ও জীববৃত্তি সম্পন্ন মানুষের হৃদয়ের সমর্থন পায়নি। ঠিক এই পরিস্থিতিতে আত্মসুখ এবং জনহিত— এই দুয়ের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য ইউটিলিটি তত্ত্বের সৃষ্টি। বেন্থাম ও মিলের হাত ধরে এই উপযোগবাদ শুধু যে পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় আলোড়ন ফেলেছিল তা নয়; ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মানসে তা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। বাঙালি সমাজেও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। উপযোগবাদী চিন্তা ও চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। উপযোগবাদী দর্শনের ফলেই বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে বর্জন করে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনা করতে শিখেছিল তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সদস্যরা এই মতবাদ দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। সমাজের উন্নয়নের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উপযোগবাদী দর্শনের প্রভাব ছিল অপরিসীম।

এই উপযোগবাদী ভাবধারা প্রসারের একটি পটভূমি তৈরি হয়েছে। ইংরেজ শাসনের পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষে রাজতন্ত্র কায়েম ছিল। দেশীয় রাজাদের প্রজা হিসাবে সাধারণ মানুষকে জীবনযাপন করতে হত। যেখানে সাধারণের স্বার্থরক্ষা রাজার খেয়াল

খুশির উপর নির্ভর করত। এরপর শক্, হূণ, মোঘল ইত্যাদি নানা বিদেশি শত্রুর আক্রমণ এবং বিদেশি শাসনের অন্তরালে জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছা চাপা পড়ে গিয়েছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল অঙ্গনে ব্রাত্য ভারতবাসী তখন আত্মপরিচয় প্রকাশের বিকল্প পথ সন্ধান করতে থাকে। পরাজিত, অবহেলিত, সর্বস্ব লুণ্ঠিত ভারতবাসীর কাছে একমাত্র কৃচ্ছ্র সাধনের মধ্য দিয়ে পরামুক্তি লাভের রাস্তাই ছিল উন্মুক্ত। উপনিষদীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এক অদ্ভুত জগত বিমুখতাকে প্রশ্রয় দিতে থাকে তারা। অর্থ ও কাম যে মানব জীবনের অন্য দুটি পুরুষার্থ সে কথা ভুলে গিয়ে তারা আঁকড়ে ধরে ধর্মকে। যে ধর্মের অভিমুখ হয়ে দাঁড়ায় চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ। ধর্মের সঙ্গে অভ্যুদয়ের সম্বন্ধটিতে বিস্মৃত হয় তারা। ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় এক এবং অদ্বিতীয় নিঃশ্রেয়সের পথ। মোঘল শাসন অবলুপ্ত হওয়ার পর শুরু হয় ইংরেজ শাসন। বণিকের ছদ্মবেশে এও ছিল এক ধরনের রাজশাসন। তবে মোঘল শাসনের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের একটি মৌলিক তফাত ছিল। মোঘলরা ভারতবাসীকে বাধ্য করেছিল তার সমস্ত জাগতিক আকাঙ্ক্ষাকে অবদমিত করতে। কিন্তু ইংরেজরা তাদের ভোগবাদী জীবনযাত্রাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়রা সেই ভোগের রাস্তাকেই জীবনের সদর রাস্তা হিসাবে দেখতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে যে সব কামনাকে ভারতবাসী অবদমিত করেছিল সেই কামনা পূরণে ভোগের রাস্তা ইংরেজরা যেন হাট করে খুলে দেয়। ফলে চিরাচরিত শাস্ত্র গ্রন্থগুলির উপর ভারতীয়রা বিশেষত বাঙালি যেমন বীতস্পৃহ হয়ে পড়ে তেমনি এপর্যন্ত যেসব বিষয় শাস্ত্র নিষিদ্ধ ছিল সেগুলি জনমানসে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

একদিকে চিরায়ত আদর্শে আনাস্থা জ্ঞাপন অন্যদিকে এতদিনের অবদমিত কামনার উগ্র প্রকাশ কোনটিই যে ভারতীয়দের পক্ষে ভালো হয়নি তা বলাবাহুল্য। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের মন্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য—

> ... কয়েক শতাব্দী হল ভারতবাসী ঐহিক অভ্যুদয়ের কথা এত বেশি বিস্মৃত হয়েছে এবং ততোধিক মাত্রায় অনধিকার অনুশীলিত আধ্যাত্মিক কল্যাণের মোহে এত বেশি বিভ্রান্ত হয়েছে যে, সে এখন সত্যসত্যই 'ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ'।[১]

ইংরেজদের হাত ধরে যেমন ভোগবাদ ও প্রয়োজনবাদ পরাধীন ভারতবর্ষে দ্রুত প্রসারিত হয় তেমনই সর্বাধিকের স্বার্থরক্ষার যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইউরোপে কার্যকরী হয়েছিল ভারতবর্ষে তার প্রসারের সপক্ষে জনমত তৈরি হয়। আর যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসন ব্যবস্থার আদর্শটি মিল বেন্থামীয় দর্শনের অনুসারী ছিল তাই উপযোগবাদকে আহ্বান জানানোর মানসিকতা ভারতবর্ষে দ্রুত প্রসার লাভ করে।

এখানে বলা দরকার যে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শুধু যে প্রয়োজন পূরণকে উৎসাহিত করার কারণেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা নয়। ইউরোপের দিকে দৃষ্টি রাখলে উপযোগবাদের বেশ কিছু সুবিধার দিক আমাদের নজরে আসে। সর্বাধিক লোকের জন্য সর্বাধিক সুখ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযোগবাদীরা বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার ও নিয়ম প্রণয়ন করেন। উপযোগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ব্যক্তি ও সরকারের সংস্কার-নীতি প্রণয়ন যেমন হয়েছিল তেমনি পাশ্চাত্যের স্বৈরাচারী মতবাদকে খন্ডন করে গণতান্ত্রিক আদর্শের ধারণা মানুষের মনে স্থান পেয়েছিল। এছাড়াও মানুষ স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের অধিকার লাভ করে। বিভিন্ন সাংবিধানিক নিয়মকানুনের সংস্কার যেমন সম্ভব হয়েছিল তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়েছিল উপযোগবাদী নীতি প্রণয়নের ফলে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের আধুনিকীকরণ, ইংল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ,

---

[১] *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, কালিদাস ভট্টাচার্য, পৃ. ৪।

ভূমি সংস্কার, আইন সংস্কার ও কারাগার সংস্কার, ব্রিটেনে দাস প্রথার বিরুদ্ধে সমাজ সচেতনতার সৃষ্টি এবং মিশনারি প্রথার প্রচলন প্রভৃতি সমাজের নানা ক্ষেত্রে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। সর্বোপরি, উপযোগবাদবাদ ব্যক্তি থেকে সমষ্টির ধারণার প্রসার ঘটায়।

উপযোগবাদ শুধু যে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতেই প্রভাব ফেলেছিল এমন নয়, প্রাচ্য তথা ভারতবর্ষেও এর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপযোগবাদের অন্যতম প্রবর্তক, জেমস মিল ১৮১৯ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসাবে ভারতবর্ষে নিযুক্ত হন, আর তারপর থেকেই ভারতের জনমানসে উপযোগবাদের প্রভাব দেখা দিতে শুরু করে। তাঁর 'History of British India' গ্রন্থে উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। জেমস মিল তাঁর অফিসিয়াল চিঠিপত্রে 'উপযোগিতা' শব্দটি প্রায় ব্যবহার করেছেন। জেমস মিলের পর তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলও ১৮২৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে যোগদান করেন এবং ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্মের অবসরে 'Utilitarianism' গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেন। প্রশাসক হিসাবে জেমস মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের উপস্থিতি ভারতবর্ষে উপযোগবাদী ভাবধারা প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের উপনিবেশ হলেও সেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। কাজেই কলকাতা তথা বঙ্গ সংস্কৃতিতে ইংরেজি শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকের মধ্যেই ইউটিলিটিতত্ত্ব বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। ইংরেজ উপনিবেশ পরাধীন ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দের নানা আদবকায়দা অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে সায় দিতে শুরু

করেছিল উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বে। যাদের হাত ধরে বঙ্গীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত বলে মনে করা হয় সেই রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে ইউটিলিটি তত্ত্বের প্রভাব প্রবল। এই নৈতিক মতবাদ প্রশাসনিক কাজকর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাবিদদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এই মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নানা সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁরা। যে সকল বাঙালি মনীষীর মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২১-১৮৮১), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯০) কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮১৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ।

৩.২ রাজা রামমোহন ও উপযোগবাদী চিন্তার সূত্রপাত

আধুনিক বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা যে কোনো প্রগতিশীল মনোভাবের প্রথম সূচনা রামমোহন রায়ের বিস্ময়কর প্রভাব থেকে শুরু হয়— এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। বাঙালি জাতিকে মধ্যযুগের গুটি কেটে আধুনিক যুগের মহাকাশে উড়তে শিখিয়ে ছিলেন তিনি। একাধারে তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, উপনিষদের রসতত্ত্বে বিশ্বাসী, সমাজ সংস্কারের একনিষ্ঠ যোদ্ধা এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারের ঘোর শত্রু। আবার অন্যদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি অন্যতম চিন্তানায়ক। আত্মপ্রত্যয়, আধুনিক যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং উদার মানবতাবোধ দিয়ে রামমোহন তার সাহিত্য ও জীবনকে ঋদ্ধ করেছেন যা আজও বাংলা তথা বাঙালীর চিন্তা জগতে আলোচনার অন্যতম প্রসঙ্গ।

শাস্ত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অনুবাদ শুরু করেন

রামমোহন। জনবিরোধী প্রথাগুলি থেকে সমাজকে মুক্ত করার যেসব চেষ্টা এই মনীষী করেছিলেন সেই সতিদাহ প্রথার বিলোপ, নারী শিক্ষার প্রসার এসব সর্বজনবিদিত। এই সমাজ সংকারের প্রেরণা অনেকখানিই এসেছিল উপযোগবাদী ভাবধারা থেকে। উপযোগবাদী বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত পত্র যোগাযোগ থেকে জানা যায় যে, তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রামমোহন বেন্থাম ও জেমস মিলের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে গমনকালে বেন্থামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করেন। ইংল্যান্ডে থাকা কালে বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। বেন্থামও রামমোহনের অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। রামমোহনও বেন্থামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বেশ কয়েকটি পুস্তক বিলেত থেকে প্রকাশের ক্ষেত্রে বেন্থাম সহযোগিতা করেছিলেন। এভাবে বেন্থামের সঙ্গে রামমোহনের একটি ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং তাঁর উপযোগবাদী মতাদর্শের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

৩.৩ অক্ষয় কুমারের চিন্তায় উপযোগবাদী ঝোঁক

অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের মতোই বাঙালির চিন্তা ক্ষেত্রে তাঁর পরিচ্ছন্নতা ও শক্তির সঞ্চার করে দিয়ে গেছেন। তিনি নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিশুদ্ধ ঐতিহ্য রেখে গেছেন আমাদের কাছে। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ববোধিনীর প্রথম প্রকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ বাঙালি সমাজের ব্যতিক্রম। সারাজীবন তিনি শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করেছেন, বিশুদ্ধ ও নির্মোহ বুদ্ধির সাধনা করেছেন। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থেকে এই জ্ঞানতাপস বুদ্ধিজীবী বাঙালি মানসের কাছে এক বিশেষ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। রামমোহন পরবর্তী বাংলার দার্শনিক বিপ্লবীদের মধ্যে অক্ষয়

কুমার দত্ত অগ্রগণ্য। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শ দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। যার ভক্তিবাদী দিকের প্রধান পথিক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; অন্যদিকে যুক্তিবাদী দিকটিতে অগ্রসর হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। বেন্থামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা তিনি উজ্জীবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই প্রভাব সর্বাধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। উপযোগবাদীদের মতো সুখ বলতে এঁরা সর্বজনীন সুখকে বুঝিয়েছেন। তবে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বর্তমান। অক্ষয়কুমার যেখানে ব্যক্তি মানুষের বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টিগত উন্নতির কথা বলেছেন।[২] অক্ষয়কুমার মিলের যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন বিষয়ক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেছিলেন। মানুষের সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে সমাজের প্রকৃতির উপর- এই অ্যারিস্টটলীয় ভাবধারাকে বেন্থামের দর্শনকে সাথে যুক্ত করার প্রয়াস করেছিলেন তিনি।

৩.৪ ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মকাণ্ডে উপযোগবাদের প্রভাব

বিদ্যাসাগর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে সময়টি ছিল ‘age of reason’ এবং ‘rights of man’ এর যুগ। অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার উন্মেষ কাল। বিদ্যাসাগর এই কালের সার্থক পুরোহিত। তাই উনিশ শতকের সেই চিত্তসংকট ও প্রেমের দ্বন্দ্বে বিদ্যাসাগর কখনো উদ্বেল আবার কখনো সংশয়বাদী। বিদ্যাসাগরের জীবনে এই যে নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব-সংশয় তা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালি মানসেরই প্রতিচ্ছবি। উনিশ শতকের বাংলাদেশে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উপকৃত মেরুদন্ডহীন জমিদার শ্রেণী ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, এবং বুর্জোয়াদের শোষণে সর্বস্বান্ত কৃষক ও সাধারণ মানুষ, তখন সেই প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব।

---

[২] *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৬২।

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব স্পষ্ট। জন স্টুয়ার্ট মিলের 'Logic' এবং হিউমের 'A Treatise on Human Understanding' এই দুটি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য তালিকায় সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের অন্তর্ভুক্তির ফলে যে কুপ্রভাব ছাত্রদের মধ্যে পড়বে তা থেকে তাদের রক্ষার জন্য তিনি মনে করতেন, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের প্রতিষেধক বার্কলির Inquiry নয়, মিলের Logic ও হিউমের Treatise। সাধারণ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি রচনা করেন বর্ণপরিচয়। বিধবা বিবাহ আন্দোলন বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সমাজ সংস্কার আন্দোলন। ১৮৬০ সালে তৎকালীন হিন্দু সমাজের বিধবা বিবাহের বিষয়ে তিনি সর্বপ্রথম বয়স নির্ধারণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা নিয়ে তিনি কর্মজীবনের সূচনাকাল থেকে নারী শিক্ষা প্রসারে কঠোর শ্রম দিয়ে গিয়েছেন। এই সকল সমাজ সংকারের প্রেরণা অনেকখানিই তাঁর মধ্যে এসেছিল উপযোগবাদী ভাবধারা থেকে।

আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্ত ঘটনা একজন সমাজ সংস্কারকের কর্ম প্রচেষ্টা বলেই মনে হবে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার অন্তরালে নিহিত থাকে একটি ভাবাদর্শ। শাস্ত্রসম্মত বলেই কোনো একটি প্রথাকে মেনে চলতে হবে এই ভাবনা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের ধারণার পরিপন্থী। স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সতী হওয়া অধিকাংশ বিধবার কাছে কাম্য ছিল না। এইভাবে অকাল বৈধব্যকে স্বীকৃতি দিয়ে সমস্ত কামনা বাসনাকে অসময়ে জলাঞ্জলি দেওয়া যে সর্বাধিকের ইচ্ছার প্রতিফলন নয়, এর অন্তরালে যে অধিকাংশের কান্না চাপা পড়ে আছে সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মত মহান মানুষেরা সমাজ সংস্কারের কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

৩.৫ ইউটিলিটি'র প্রসারে কেশবচন্দ্র এবং ডিরজিও

কলকাতার কলুটোলায় বিখ্যাত সেন পরিবারে ১৮৩৮ সালে ১৯শে নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন প্যারীমোহন সেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সচিব পদে নিযুক্ত হন।[৩] ১৮৫৯ সালে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। বয়স্ক শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা ও সমাজোন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজকে একটি বৃহত্তর গণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় সংস্কৃতির ধারায় সঙ্গে তিনি সুপারিত ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিলেন মুক্ত ও উদার। রাজা রামমোহন দেখানো পথকে অনুসরণ করে তিনি সমাজ সংস্কার ও নানা কল্যাণকর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেশবাসীর নৈতিক উজ্জীবন ও সামাজিক নানা বিধিব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি Indian Refoms Associations নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৪]এই প্রতিষ্ঠানে মূল কাজ ছিল নারীর সামাজিক অধিকার অর্জন ও উন্নতি সাধন, সর্বাত্মক শিক্ষার প্রবর্তন করা, নানাবিধ সেবামূলক কার্যের আয়োজন করা প্রভৃতি।

কেশবচন্দ্র উপযোগবাদের সঙ্গে সরাসরি জড়িত হয়েছিলেন। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮৭০ সালে তিনি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন

---

[৩] *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা*, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৮৪।

[৪] তদেব, ৯৮।

দার্শনিক মিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি সমাজে অবহেলিত নারীদের পক্ষে কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় তাঁর কন্যা চতুষ্টয় স্নাতক ডিগ্রি পাশ করেছিলেন। নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন প্রথম সারিতে।

বাঙালি একটি ভাষাভাষী গোষ্ঠী মাত্র নয়— একটি পূর্ণাঙ্গ জাতি, এই বিশ্বাসের পুরোধা ছিলেন ডিরোজিও। তার হিন্দু কলেজের শিক্ষা সেকালের ছাত্রদের কেবল আত্মসচেতন নয়, সমাজ সচেতনও করেছিল। সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল স্বদেশ প্রীতি ও স্বাধীনতা বোধ। তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছিলেন যে, নিজের মনে বিচার ও যাচাই না করে কেউ যেন ঈশ্বর বিশ্বাসী না হয়ে ওঠে। এই ধারণা ও উপলব্ধির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া রক্ষণশীল মনোভাবের গোড়ায় প্রথম আঘাত হানে তার ছাত্ররা। মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা অটুট ছিল বলেই বিচারহীন অন্ধবিশ্বাস তার চোখে ছিল মূঢ়তা।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় ডিরোজিও-এর নেতৃত্বে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক একটি তরুণ দল গড়ে ওঠে। এই দলের সদস্যরা প্রগতিবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দলের প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দলটি সনাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। সমস্ত কলকাতা শহরে এই দলটি বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। এঁদের সাধারণ ধর্ম ছিল মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে গোঁড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানানো। এদের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন – বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরা ছিল নিউটনের অনুগামী। ধর্মের ক্ষেত্রে এরা ছিল ডেভিড হিউম ও পেইনের ভক্ত। রাষ্ট্রভাবনা ও অর্থনীতির বোধ গভীরভাবে

প্রভাবিত ছিল অ্যাডাম স্মিথ, জেরেমি বেন্থামের ভাবনা দ্বারা। এই ডিরোজিও অনুগামীদের প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট বা বেঙ্গল রেনেসাঁ সংগঠিত হয়েছিল। ডিরোজিয়ের ভাবনা যেহেতু উপযোগিতাবাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি নানা প্রগতিশীল ভাবনায় সমৃদ্ধ ছিল তাই মিল বেন্থামীয় দর্শন বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল এই দলের প্রতিটি সদস্য এবং সেই সঙ্গে সে যুগের শিক্ষিত বঙ্গ সমাজের উপর।

৩.৬ বঙ্কিমের অনুশীলন ধর্ম ও ইউটিলিটির বাস্তব রূপায়ন

উপযোগবাদের প্রভাব যে বাঙালি মনীষীর রচনায় সর্বাধিক প্রতিফলিত তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ইউটিলিটিতত্ত্ব অনেকের সাথে বঙ্কিমেরও চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সাথে আমরা কম বেশি সকলেই পরিচিত। কারণ জল বাতাসের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্পর্ক যতটা, বঙ্কিম সাহিত্যের সাথে এদেশের সাহিত্য সংস্কৃতির সম্বন্ধ ঠিক ততটাই। প্রবন্ধকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম পথিকৃৎ। শুধুমাত্র উপন্যাসের জন্যই তিনি একসময় 'সাহিত্য সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সাথে আমরা তেমন পরিচিত নয়। কারণ তিনি প্রথাগত অর্থে কোনো দার্শনিক ছিলেন না। তবে দার্শনিক বলতে আমরা যাঁদেরকে বুঝি বা জগত ও জীবন সংক্রান্ত নানা জটিল তাত্ত্বিক সমস্যার আলোচনা করে যারা দার্শনিক নামে পরিচিত হয়েছেন, তেমন মৌলিক ও মহৎ চিন্তা ভাবনার আভাস বঙ্কিমের রচনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিম রচিত প্রবন্ধগুলোর দিকে আমরা যদি আলোকপাত করি তাহলে দেখব যে, সেখানে তাঁর দর্শন বিষয়ক চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে। 'সাংখ্য দর্শন', 'জ্ঞান', 'মনুষ্যত্ব

কী', 'চিত্তশুদ্ধি' এবং 'ভালবাসার অত্যাচার' ইত্যাদি বিভিন্ন প্রবন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'দেবী চৌধুরানী', 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম' ইত্যাদি উপন্যাসে দর্শনের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাস ত্রয়ীতে বীররসের আশ্রয়ে সহজবোধ্য রূপে বঙ্কিম ব্যক্ত করেছেন গীতার নিষ্কামকর্ম তত্ত্বের গুরুগম্ভীর দর্শন। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে এক বিশেষ নীতি দর্শন। যার সুফল হিসাবে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের সমাপ্তে লেখকের ছিল অমোঘ ভবিষ্যতবাণী – "আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"[৫] বঙ্কিম তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং অন্যান্য রম্যরচনা গুলোতেও লঘু চালে দর্শনচিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থটি সরাসরি দর্শন সংক্রান্ত না হলেও নানা দার্শনিক প্রসঙ্গ এতে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া বঙ্কিম রচিত 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে এক উচ্চ স্তরের দর্শন ব্যক্ত হয়েছে।

বঙ্কিমের চিন্তা ভাবনায় ভারতীয় দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের এক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় ফরাসী দার্শনিক কোঁতের দৃষ্টিবাদ, রুশোর সাম্যবাদ, বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ, ডারউইন ও স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রভাব স্পষ্ট। প্রথম জীবনে তিনি পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষ মানবতাবাদী চিন্তা এবং আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু অপ্রত্যক্ষ, অলৌকিক এবং ঐশ্বরিক শক্তির প্রতি বঙ্কিমের বিশ্বাস বরাবরই অটুট ছিল। বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমের মনে সযত্নে লালিত সাকার ঈশ্বর পূজার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁকে উত্তর জীবনে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও বেদ পুরাণাদির মধ্যে মানুষের পরম কাঙ্খিত সত্যের সন্ধানে ব্রতী করেছিল। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও

[৫] *বিষবৃক্ষ*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১১০।

বিশ্বাসকে আধুনিক যুক্তি বিচারের কষ্টিপাথরে পরিশোধিত করে সে যুগের শিক্ষিত সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

নবোদিত পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন কে বঙ্কিম স্বাগত জানালেও ভারতের ধ্রুপদী ভাষা, ঐতিহ্য ও বেদ উপনিষদের দর্শনের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি যুক্তিহীন অন্ধ অতীতচারিতার পক্ষপাতী কোনোদিনই ছিলেন না। আবার ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে যুবসম্প্রদায় ভারতের চিরায়ত পরম্পরার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শনের যে খেলায় মেতেছিল তাও তাঁর অনুমোদন পায়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব একসময় বঙ্গ সমাজ ব্যবস্থাকে নড়িয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে সাবেকী ধ্যান ধারণা, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিধৃত যে আদর্শবোধ তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাই দস্তুর হয়ে উঠেছিল। ইংরেজি শিক্ষায় এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র সেই পথ গ্রহণ করেননি। যুক্তি তর্কের বীক্ষায় নবযুগের আলোয় তিনি যাচাই করতে চেয়েছিলেন হাজার হাজার বছরের ভারতীয় পরম্পরা বাহিত জ্ঞান ভাণ্ডারকে। ভারতীয় ঐতিহ্যের নির্বিচার অনুগমন তাঁর লক্ষ্য ছিল না। আবার তিনি বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতিতে পাশ্চাত্যের জৌলুস স্বীকার করে নিয়েও তার অন্তর্নিহিত দোষ ত্রুটির কথা বলতে কুণ্ঠিত হননি।

বঙ্কিম পরবর্তী ভারতীয়রা হিতবাদের দ্বারা ততখানি প্রভাবিত হয়নি যতখানি প্রভাব আমরা বঙ্কিমের মধ্যে লক্ষ্য করি। সাবেকী হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও বঙ্কিমের উপর বেন্থাম, মিল ও কোঁতের প্রভাব যে পরেছিল তার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে বলে মনে হয়। মনে রাখতে হবে যে সময়ে বঙ্কিমের শিক্ষা শুরু হয়েছিল সেই সময় ইউরোপীয় চিন্তার জগতে বেন্থাম, কোঁত ও মিলের ভাবধারার জোয়ার বয়ছে।

ভোগবাদের প্রভাব ইউরোপে ছিলই এবং সেই ভোগবাদী মানসিকতা যে অন্যের সুখ লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাও সত্য। নিজের সুখকে অব্যাহত রেখে অন্যের সুখে প্রতিবন্ধক না হওয়ার একটা চেষ্টা বিচারশীল মন মাত্রকেই দ্বন্দ্বে ফেলে। এই সমস্যার একটি সহজ সমাধান ইউরোপ পেয়েছিল বেন্থাম ও মিলের হাত ধরে। একদিকে ঈশ্বর বা অতিলৌকিকে বিশ্বাস গ্রহণের দায় থেকে অব্যাহতি, অন্যদিকে আত্মসুখ বজায় রেখে পরসুখের ব্যবস্থা র‍্যাশ্‌নালিস্টদের (Rationalists) কাছে এক উত্তম সমাধান ছিল। তাই ইউটিলিটি তত্ত্বের স্তুতিতে ইউরোপের দর্শন ও সাহিত্য যে সময় আচ্ছন্ন ছিল ঠিক সেই সময় নব্য ইংরাজি শিক্ষিত বঙ্কিমের মনেও তা বিশেষ ভাবে দাগ কেটেছিল। জীবনবাদ, অস্তিত্ববাদ, মানবতাবাদ, পুনর্জাগরণবাদ – এসবের মধ্যে অনেক ইতিবাচক দিক যে আছে তা সকলেই স্বীকার করেন। ইংরাজি শিক্ষিত বঙ্কিম স্বাভাবিক ভাবেই এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই মতবাদগুলির প্রতি আকর্ষণ থেকেই তার প্রতিসঙ্গী হিতবাদের প্রতি বঙ্কিমের আসক্তি জন্মেছিল।

বিশেষত ইউটিলিটি তত্ত্বের প্রাণপুরুষ বেন্থাম ও মিলের প্রতি বঙ্কিমের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উন্মেষ হয়েছিল। এই শ্রদ্ধাবোধ থেকেই 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে তিনি মিল বেন্থামীয় তত্ত্বের জয়গান গেয়েছেন। মিলের প্রশস্তি করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

> রাজার অত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব পণ্ডিত ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের যত্ন ও বিচক্ষণতা, তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় দিবে।[৬]

[৬] ভালবাসার অত্যাচার, *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৫৪৫।

আবার, মিলের মৃত্যুর পর শোকাহত বঙ্কিম বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তাঁর স্মরণে 'জন স্টুয়ার্ট মিল' নামে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> ছয় হাজার মাইল দূরে থাকিয়া আমরা এই শোক পাইয়াছি, না জানি ইংল্যান্ডবাসীরা কতই দুঃখ করিতেছেন! কিন্তু কেনই দুঃখ করি তাহা বলা যায় না। যে মহোদয় আপন বুদ্ধিবলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ঋণী করিয়াছেন, যিনি যাবজ্জীবন ঋণ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যিনি এতাদৃশ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন যে, যে কেহ হউক যত্নসহকারে আবেদন করিলেই তাহাঁর বদান্যতার ফলভোগী হইতে পারিবে, এরূপ মহাপুরুষ এত কাল পরে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন বলিয়া কেনই এত কাতর হই? তথাচ মৃত্যুশোক দূর হইবার নহে, 'মিল নাই' এই কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই ব্যথিত হয়।[৭]

তাঁর এই সমস্ত রচনা ও প্রশস্তি লক্ষ্য করলে মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক যে তিনি ইউটিলিটি তত্ত্বের একজন সমর্থক ছিলেন। বিশেষত সুখের হাতছানি ছাড়া মানুষের পক্ষে যে নৈতিকতার পথে অটল থাকা সম্ভব নয় উপযোগবাদীদের সেই দাবির যৌক্তিকতা বঙ্কিম অনেকখানি স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলেই মনে হয়। তাই 'ধর্মতত্ত্ব' - এ ধর্মের নব ভাষ্য রচনা করে সুখই যে ধর্মের অভিমুখ সে কথা প্রতিষ্ঠার একটা মরিয়া চেষ্টা বঙ্কিমের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' এর শুরুতেই একটি প্রচলিত বিশ্বাস সম্বন্ধে শিষ্যের বয়ানে প্রশ্ন তুলেছেন। এটা একটা সাধারণ বিশ্বাস যে ধার্মিক ব্যক্তি মাত্রই সুখী হয়। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মের জীবন পালন করেও মানুষকে অসুখী হতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় ধর্মের জীবন সুখের জীবন এরকম দাবি করা যায় না। বরং স্বীকার করা ভালো যে, ধর্মের অভিমুখ অভ্যুদয় নয় নিঃশ্রেয়স।

---

[৭] জন স্টুয়ার্ট মিল, তদেব, পৃ. ১১৩৯।

এককথায় ধর্মের অভিমুখ ইহজাগতিক সুখ নয়, পারত্রিক পরমার্থ লাভ। ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাশীল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে মিল বেন্থামের মত পারমার্থিকে বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহজাগতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে নৈতিকতাকে রক্ষার যে চেষ্টা হিতবাদীরা করেন তা গভীরভাবে রেখাপাত করে বঙ্কিমের মনে। তাই তিনি বলেছেন— 'ধর্মের লক্ষ্য হল সুখ'। প্রশ্ন উঠবে এই সুখ কি পরাজাগতিক সুখ, ইহজাগতিক দুঃখের বিনিময়ে যাকে পেতে হয়। শিষ্যের বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রশ্নও তুলেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সমস্ত আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে তাঁর উক্তি, "ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ"।[৮]

এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে ঐহিক সুখকে অবজ্ঞা হিতবাদীরা করেননি বরং সেই সুখের পরিমাণগত সর্বাধিকত্ব রক্ষার চেষ্টা করেছেন তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রও জাগতিক সুখের বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষের যে চতুর্বিধ বৃত্তির কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার মধ্যে অন্যতম হল শারীরিকী বৃত্তি। জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী – এইসব মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপূরণ যেমন মনুষ্য মাত্রের কর্তব্য তেমনি শারীরিকী বৃত্তিগুলির উন্নয়ন ও পরিতৃপ্তি সকল মনুষ্যের কর্তব্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কাম, ক্রোধ, লোভ এতাদৃশ তথাকথিত শারীরিক চাহিদাগুলির উচ্ছেদই বিধেয়। কামাদি বৃত্তি যতখানি কুবৃত্তি হিসাবে ভারতীয় ঐতিহ্যে পরিচিত, ততখানি সুবৃত্তি হিসাবে নয়। কিন্তু বঙ্কিমের বিচারে কোনো ইন্দ্রিয়গত চাহিদাই কুবৃত্তি হতে পারে না। কাম বৃত্তি ছাড়া মনুষ্য প্রজাতির লোপ হবে বলে তিনি যেমন আশঙ্কা প্রকাশ করেন তেমনি ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিরও মূল্য সমাজ জীবনে রয়েছে বলে

[৮] ধর্মতত্ত্ব, তদেব, পৃ. ৬০৭।

তিনি বিশ্বাস করেন। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং স্বদেশরক্ষা ক্রোধের অপেক্ষা রাখে। তেমনি লোভ ছাড়া কোন ইষ্টই সম্ভব হতে পারে না। তাই কামাদি বৃত্তির উচ্ছেদ কখনই অনুমোদন করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। পরিবর্তে তাদের সংযমের কথা বলেছেন।

আসলে বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন চতুর্বিধ মানবীয় বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ফুরণ বা কর্ষণ। যাকে তিনি 'অনুশীলন ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যদি এই বৃত্তি গুলির কর্ষণ, পরিতৃপ্তি ও সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হয় তাহলে মানুষ প্রকৃত সুখের আস্বাদ লাভ করবে। তাই সুখই ছিল তাঁর অনুশীলন ধর্মের লক্ষ্য। প্রশ্ন হতে পারে ধর্মের লক্ষ্য তো মোক্ষ, তা সুখ হবে কেন? যাকে আমরা সুখ বলি তা পাশ্চাত্ত্য 'কালচার' এর লক্ষ্য হতে পারে, ভারতীয় ধর্মের অভিমুখ হবে কী করে? এপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের প্রতিক্রিয়া এই যে, সুখ ও মোক্ষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যোগীদের কাছে যা মোক্ষ বঙ্কিমের কাছে তা একপ্রকার সুখই। তবে সেই সুখ অত্যন্ত উচ্চ স্তরের সুখ যার সঙ্গে সাধারণ ইন্দ্রিয়সুখকে গুলিয়ে ফেলা যায় না। এভাবে হিতবাদের ছদ্মবেশে সুখবাদের যে তত্ত্ব মিল বেন্থাম প্রচার করেন সেই সুখের ধারণাকে ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে মর্যাদা দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন সমকালীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, কৃচ্ছ্রসাধন কখনই মুক্তির রাস্তা হতে পারে না। ত্যাগের মাধ্যমে, বৈরাগ্যের মাধ্যমে মুক্তি লাভের যে আদর্শ উপনিষদের সময় থেকেই ভারতবর্ষকে প্রভাবিত করেছিল সেই আদর্শে সমকালীন ভারতীয়রা অনাস্থা প্রকাশ করেননি। কিন্তু যোগের সেই আদর্শকে কোটিকে গুটিকের আদর্শ বলেই তারা বিশ্বাস করতেন। যোগী জীবনের সেই আদর্শকে গৃহী জীবনের মধ্যে প্রয়োগ করতে গেলে তার পরিণতি যে ভালো হবে না তা উপলব্ধি করেছিলেন এরা। বিশেষত সংসার জীবনের মধ্যপথে সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী

হওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছিল তৎকালীন বঙ্গ সমাজে। এর মূলে যতটা পরামুক্তির বাসনা ছিল তার চেয়ে অনেকবেশি ছিল সংসার জীবনের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়ার বা সাংসারিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটা প্রণোদন। সংসারে থেকে আপন আপন কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত মুক্তি লাভ সম্ভব তা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর সকলেই বিশ্বাস করতেন। যোগী এবং ভোগী দুই সম্প্রদায়কেই সমানভাবে অধার্মিক বলে মন্তব্য করেছেন বঙ্কিম। কামাদি বৃত্তির অতি কর্ষণের কারণে ভোগীরা যদি দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে থাকেন তাহলে কিছু শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিকে অবহেলার কারণে যোগীরাও সমানভাবে অধার্মিক বলে বঙ্কিমচন্দ্র মত প্রকাশ করেন। বৈরাগ্য সাধনের মধ্যে মুক্তি লাভ যে তার কাঙ্ক্ষিত নয় বরং অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে নিজের আনন্দ স্বরূপকে রেখেই তা সম্ভব সেকথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ছদ্ম বৈরাগ্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও। মানবজীবনে সুখের যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদীদের এই ভাবনার সঙ্গে এরা অধিকাংশই একমত। যদিও সেই সুখকে স্থূল ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে ভারতীয় চিন্তকরা রাজি নয়। সুখের পরিধিকে মোক্ষ পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন বঙ্কিম। গুণগত উৎকর্ষতা ঘটিয়ে তাকে আনন্দের স্তরে নিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ – যে আনন্দ সাধারণ অর্থে যাদের সুখ-দুঃখ বলা হয় দুইকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে উপযোগবাদের ব্যর্থতা

চতুর্থ অধ্যায়

সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে উপযোগবাদের ব্যর্থতা

৪.১ উপযোগ-নীতিতে ভারতীয়দের মোহভঙ্গ

ইউটিলিটি তত্ত্বের প্রভাব এক সময় প্রায় সমগ্র ইউরোপে ছিল সর্বাত্মক। কিন্তু যতখানি সাড়া জাগিয়ে প্রতিশ্রুতিমান নীতিতত্ত্ব হিসাবে এর আবির্ভাব ঘটেছিল, পরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় তা ততখানি দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়নি। মিল বেন্থামীয় এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা আপত্তির অবতারণা করেছেন পরবর্তী নীতি চিন্তকরা। এ ব্যাপারে বেন্থামীয় হিতবাদ যে পরিমাণ সমালোচনার মুখোমুখি হয়, মিল সম্মত হিতবাদের আকারটির বিরুদ্ধে ততবেশি আপত্তি ওঠে না। তবে কিছু সাধারণ আপত্তি রয়েছে যেগুলি হিতবাদের যে কোনো রূপ সম্বন্ধেই সমভাবে প্রযোজ্য। এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য— সমকালীন ভারতীয় চিন্তার আলোকে উপযোগবাদের বিচার। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বেন্থাম ও মিল প্রবর্তিত উপযোগতত্ত্ব যখন পাশ্চাত্ত্য চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, তখন ভারতীয় চিন্তাকে তা সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। বিশেষত ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি সমাজের উপর গভীর ভাবে রেখাপাত করে এই মতবাদ। মিলের রাজনৈতিক দর্শন থেকে নীতি দর্শন মনস্ক অনেক ভারতীয় ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনীতিক ও দার্শনিকদের চিন্তার উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু হিতবাদের যে ধারা প্রাচীনকাল থেকে ভরতীয় ভূখণ্ডে প্রবাহমান ছিল, মিল বেন্থামীয় হিতবাদ কখনই সেই সনাতন হিতবাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হল এখানে সর্বাধিকের স্বার্থে সংখ্যালঘুকে আত্মবলি দিতে হয়। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কথা চিন্তা করতে গিয়ে সমাজের একটি দিককে অবহেলার প্রস্তাব রাখে এই মতবাদ। তাই ভারতীয় মনীষীদের অধিকাংশই এই পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঋষি অরবিন্দ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কেউই পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। ইউটিলিটি তত্ত্বের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি এইসকল চিন্তাবিদরা উল্লেখ করেছেন, সেগুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক।

৪.২ 'উদরদর্শন'-এর ব্যর্থতা প্রদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র

ধ্রুপদী ভারতীয় পরম্পরায় লোকহিত বা লোকসংগ্রহের যে আদর্শ অনুসৃত ছিল, তা বঙ্কিমের মনভূমিকে উর্বরা করেই রেখেছিল। তাই পাশ্চাত্য হিতবাদের বীজ সহজেই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয় বঙ্কিম মানসে। কিন্তু যৌবন উত্তীর্ণ বঙ্কিমের উপলব্ধিতে বদল আসে। তিনি ধীরে ধীরে হিতবাদের মন্দ দিকগুলি উপলব্ধি করতে শুরু করেন। তখন হিতবাদের প্রতি এক প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করে তাঁর মধ্যে। চিন্তার এই পরিবর্তনের মধ্যে আপাত অসংগতি থাকলেও তলিয়ে দেখলে ধরা পরবে যে, দার্শনিক বা মনীষীদের চিন্তা কখনই সরলরৈখিক পথে অগ্রসর হয় না। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তা নানা পর্যায়ে নানা দিকে মোড় নিয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের জীবনের ঘটনা সকলের জানা। ইংরাজি শিক্ষা, ইউরোপীয় কালচার এসবে কেতাদুরস্ত মধুসূদন দত্ত একসময় সাহেব হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তাঁর মোহ একসময় ভঙ্গ হয়। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়'[১]। জীবনবোধ এবং মনন পরিবর্তনের এই কাহিনি নতুন কিছু নয়। ট্রাকটেটাসের ভিটগেনস্টাইন যেসব দাবি করেছেন, পরবর্তীকালে ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনের ভিটগেনস্টাইন তা থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। চিত্রতত্ত্বের সীমাবদ্ধতার দিকটি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অর্থ সম্বন্ধে প্রয়োগতত্ত্ব (Use theory)-কে গ্রহণ করতে পিছুপা হননি। একই কথা বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও সত্য। হঠাৎ

[১] আত্মবিলাপ, *বিবিধ কাব্য,* মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পৃ. ৬।

আলোর ঝলকানির মতো ইউরোপীয় চিন্তা ইংরাজি শিক্ষিত ভারতীয় যুব মনে একটা আলোড়ন তুলেছিল। কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মবোধকে যখন নাগপাশের মতো চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল, তখন সেই সাবেকি পরম্পরা থেকে মুক্ত হতে চাওয়া আধুনিক ভারতীয়রা আঁকড়ে ধরেছিল পাশ্চাত্য মতবাদগুলোকে। যার মধ্যে মানবতাবাদ, ব্যক্তিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ ইত্যাদি মতবাদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল উপযোগবাদ বা হিতবাদ। যখন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ বা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেছিল, ততদিনে ইউটিলিটি তত্ত্বের গুণাগুণ অনেকখানি চর্চিত। সুতরাং পাশ্চাত্য হিতবাদের প্রতি বঙ্কিমের যে দুর্বলতা দেখা গেছে, পরবর্তী ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে তা ততখানি দেখা যায়নি।

তবে, বঙ্কিমের রচনার মধ্যে হিতবাদের প্রভাব থাকলেও এই তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষ জীবনে মিলের মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, বহিরঙ্গে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদ যতই আকর্ষণীয় বলে মনে হোক না কেন, আদতে তা কখনই চিরাচরিত ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে এক সারিতে বসার যোগ্য নয়। বঙ্কিম তাঁর শেষ উপন্যাস "সীতারাম"-এর ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মন্তব্য করেছেন—

> হায়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবার্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারিব না।[২]

[২] *সীতারাম,* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৩৯।

এই তির্যক মন্তব্যের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ভারতীয় মানসে পাশ্চাত্ত্যের প্রতি যে অন্ধ অনুরাগ সৃষ্টি হচ্ছিল, তার প্রতি তীব্র বিষোদ্‌গার করেছেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের ফলে যে এদেশের শিক্ষিত যুবকদের কল্যাণ হবে এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার যে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি অনেকখানি দূর করতে সক্ষম, সে ব্যাপারে তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু যা কিছু বিদেশীয় তাই ভালো, এবং দেশীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সব মন্দ— এই মানসিকতা কোনোদিনই সমর্থন পায়নি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। বিশেষত আধুনিকতার বিরোধী না হলেও ধ্রুপদী ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বঙ্কিমের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। শ্রীমদ্ভগবদগীতা তাঁর মানসপটে সর্বদা জাগ্রত থাকত। তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। সুতরাং মিল বেন্থামীয় সুখকেন্দ্রিক মতবাদ তাঁর কাছে যতই আকর্ষণীয় মনে হোক, কোঁতের প্রকৃতিবাদ বা ম্যাথু আর্নল্ডের 'কালচার তত্ত্ব' তাঁর মনে যতই প্রভাব ফেলুক, প্রাচীন ভারতের অখণ্ডতাবাদ ও শাশ্বতবাদের প্রভাবকে কখনই মলিন করতে পারেনি। তাই হিতবাদের সুবিধার দিকগুলিকে মেনে নিয়েও এই খণ্ডিত মতবাদ যে অখণ্ড জগৎ ভাবনার সঙ্গে মানানসই নয়, সেই বিষয়টি তিনি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন। নৈতিক তত্ত্ব হিসাবে ইউটিলিটি কতখানি অসার, তা তাঁর উপলব্ধিতে আসে। এর প্রথম পরিচয় আমরা পাই বঙ্কিমকৃত 'ইউটিলিটিতত্ত্ব'-এর বঙ্গানুবাদটির দিকে আলোকপাত করলে। "কমলাকান্তের দপ্তর" প্রবন্ধে ইউটিলিটিতত্ত্বের ভাষান্তর হিসাবে তিনি 'উদরদর্শন'[৩] কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই অনুবাদটি ব্যঙ্গার্থক। এর দ্বারা ইউটিলিটিতত্ত্ব যে স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের উপর গুরুত্ব দিতে চায়, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন তিনি।

[৩] কমলাকান্তের দপ্তর, *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৩১।

ভারতীয় ঐতিহ্যে চার্বাকের নীতি হল— 'যাবদ্ জীবেৎ সুখং জীবেদ্'[৪]। মিল ও বেন্থামের নীতিতত্ত্বকেও চার্বাকদের জড়বাদী নীতিতত্ত্বের সঙ্গে একই সারিতে বসাতে চেয়েছেন বঙ্কিম। লোকশ্রুতি আছে যে চর্বনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই দেবগুরু বৃহস্পতি প্রবর্তিত দর্শনের নাম 'চার্বাক' হয়েছে। উদরপূর্তি অর্থাৎ স্থূল সুখের পরিমাণগত আধিক্যের উপর যেহেতু পাশ্চাত্ত্য হিতবাদ গুরুত্ব দেয়, তাই একে 'উদরদর্শন' নাম দিয়েছেন তিনি। এর অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয়সুখের গুরুত্ব বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে অস্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তার শিষ্যের আশঙ্কা নিরাশ করতে বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন— "আমার এই অনুশীলন তত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না"[৫]। তবে ইন্দ্রিয় সুখের গুরুত্ব মেনে নিয়েও তার তুলনায় মহত্বর সুখও যে রয়েছে, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বঙ্কিম।

এখানে বলা দরকার যে, সুখ শব্দটি প্রায়ই নানা ধরনের হৃদয়ানুভূতিকে সূচিত করতে ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি শব্দ Pleasure, Happiness, Peace এবং Bliss এই শব্দগুলির প্রতিটির বাংলা ভাষান্তর হিসাবে 'সুখ' শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু সর্বত্র তার দ্যোতনা এক নয়। 'Pleasure' ইন্দ্রিয় তুষ্টির বাচক। যেমন জলপান, খাদ্যগ্রহণ প্রভৃতি থেকে লব্ধ তৃপ্তিবোধ। 'Happiness' নিছক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে বোঝায় না। যন্ত্রণা সহ্য করেও আপন জঠরে ভাবী সন্তান লালনে এক ধরনের স্বস্তি বা মানসিক তৃপ্তি লাভ করেন মা। 'Peace' এক শান্তির অবস্থা যেখানে জীবনের উত্থান পতনের ঘটনা ব্যক্তিকে ততখানি স্পর্শ করে না। তবে 'Bliss' আরও উন্নততর এক মানসিক অবস্থাকে সূচিত করে থাকে, যাকে এককথায় প্রশান্তি বলা যায়। সংসারী মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি

[৪] *সায়ণ মাধাবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)*, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী, পৃ. ১৫।

[৫] *ধর্ম্মতত্ত্ব*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৭।

আসে না। চিত্তকে একাগ্র করে যিনি সমাধির স্তরে উন্নীত হতে পেরেছেন, তিনিই পারেন এই অনুভূতির স্বাদ পেতে। স্পষ্টই এহেন অতিলৌকিক অনুভূতিতে বিশ্বাসী নন পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীরা। কিন্তু বঙ্কিম নিম্ন থেকে উচ্চ সুখের সব মাত্রাকেই গ্রহণ করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে হিতবাদ সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন আর একদিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া একজনের তুল্য হিতসাধন করা অধর্ম্ম।[৬]

বঙ্কিমের এই যুক্তিকে প্রয়োগ করলে সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ যে ধর্ম নয়, তা স্পষ্ট হয়। যে যুক্তিতে একজনের অপেক্ষা দশ জনের হিতসাধন ধর্ম, সেই একই যুক্তিতে দশজন অপেক্ষা শতজনের, শতজন অপেক্ষা সহস্রজনের, সহস্রজনের অপেক্ষা লক্ষজনের, লক্ষজন অপেক্ষা কোটিজনের কল্যাণ ধর্ম। এই যুক্তি প্রয়োগ করলে সর্বাধিক জন অপেক্ষা সর্বজনের হিতসাধন ধর্ম। আর সর্বজন অপেক্ষা সর্বাধিক জনের হিতসাধন অধর্ম বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ কিনা বঙ্কিমের দৃষ্টিতে হিতবাদ একটি আত্মঘাতী মতবাদ। যা রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বললে "মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ"[৭] প্রস্তাব করে; কিন্তু এই খণ্ডীকরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী।

হিতবাদীদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের আর-একটি আপত্তি হল যে, হিতবাদীরা সবসময় এমন মনোভাব পোষণ করেন, যে সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা যেন এই মতবাদের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই মতবাদ ধর্মতত্ত্বের সামান্য একটি অংশমাত্র।

---

[৬] তদেব, পৃ. ১২১।

[৭] ধর্মপ্রচার, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (*সপ্তম খণ্ড*), পৃ. ৪৭৬।

তিনি 'হিতবাদ'-কে তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের 'কোণের কোণ মাত্র'[৮] বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে হিতবাদ সত্যমূলক হলেও তা ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্রকে কখনোই আবৃত করতে পারে না। বঙ্কিমের ভাষায়, "মহাশিখর হতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হচ্ছে 'হিতবাদ' তার ক্ষুদ্রতম একটি স্রোত মাত্র"[৯]। বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট যে, পাশ্চাত্ত্য ইউটিলিটিতত্ত্ব নৈতিক তত্ত্বের একটি দিক বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ নীতিতত্ত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে না। সর্বজনের হিত বা লোকহিতের অন্দরে সর্বাধিকের হিত নিহিত রয়েছে, তাই সর্বাধিকের হিত সর্বহিতেরই অনুসারী। কিন্তু তা সর্বহিতের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। এখানে 'সর্ব' শব্দটি শুধু যে সকল মনুষ্য প্রজাতিকে নির্দেশ করছে তা নয়, বরং সর্বভূতের হিতকে নির্দেশ করে। 'সর্বভূতহিতে রতাঃ'[১০]— এই বৃহত্তম হিতের মধ্যে যেমন সর্ব মানুষের হিত নিহিত রয়েছে, তেমনি সর্বাধিক মানুষের হিত নিহিত রয়েছে।

বঙ্কিমের মতে পরহিতের ধর্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা ধর্মের গৌরব অনেক বেশি। যদি এই জগতের সকলে পরস্পরের হিত না করে, বা পরস্পরকে রক্ষা না করে, তাহলে এই জগৎ মনুষ্যশূন্য হয়ে যাবে না। অসভ্য সমাজ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারণ অসভ্য সমাজের সদস্যরা পরস্পরের হিত বা কল্যাণ না করেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। কিন্তু আমরা যদি সকলে নিজেদের আত্মরক্ষা থেকে বিরত হই, তাহলে কী সভ্য বা কী অসভ্য, কোনো সমাজেই জীব বা মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং পরহিতের আগে প্রয়োজন হল নিজের প্রাণ রক্ষা করা। আত্ম ও পরের ব্যবধান যদি আমরা দূর করতে পারি, তাহলে আত্মপ্রীতি ও জাগতিকপ্রীতি মিলেমিশে একাকার হয়ে

---

[৮] *ধর্ম্মতত্ত্ব*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১২১।

[৯] তদেব।

[১০] শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ৫/২৫।

যাবে। 'আমি' এই জগতেরই অন্তর্গত, জগতের বাইরের কেও না— এইরূপ উপলব্ধিই আত্ম-পর এই ভেদ দূর করতে সক্ষম। এপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন—

> যদি সর্ব্বভূতের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরেরও হিতসাধন যেমন ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। কারণ আমিও সর্বভূতের অন্তর্গত, ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরের রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।[১১]

বঙ্কিমের এই আপত্তিটি ইউটিলিটিতত্ত্বের প্রবক্তাদের খুব একটা চিন্তায় ফেলবে বলে মনে হয় না, কারণ পরকল্যাণের বা পরসুখের কথা তারা বলেন বটে, তবে আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে পরসুখ রক্ষা বেন্থাম বা মিল কারও আভিপ্রেত বলে মনে হয় না। আসলে 'আত্ম' থেকে 'পর'-তে উত্তরণের একটা পথ তারা সন্ধান করেছেন। হতে পারে সে পথ ততটা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বাহ্য নিয়ন্ত্রণ বা আত্ম নিয়ন্ত্রণের পথে আত্ম থেকে সর্বাধিকে পৌঁছোতে চেয়েছেন তারা। কিন্তু সমস্যা হল যে, যুক্তিতে তারা সর্ব কল্যাণের পরিবর্তে সর্বাধিকের কল্যাণে তৎপর, সেই একই যুক্তিতে আত্মকল্যাণ সর্বাধিকের কল্যণের পথে অন্তরায় হতে পারে। যদি কিছু মানুষকে (হোক না তা সর্বাধিক্য) সুখী করতে গেলে কিছু মানুষের সুখ নিশ্চিত করা না-যায়, তাহলে আত্মসুখ নিশ্চিত করতে গেলে পরসুখই বা নিশ্চিত হবে কীভাবে? আসলে আত্ম ও পরের সেতুবন্ধন ঘটাতে গেলে একটি বৃহত্তর ঐক্যসূত্র সন্ধান করতে হয়। ওই ঐক্যসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারলে দেখা যাবে, শুধু যে আত্ম ও পরের ব্যবধান ঘুচে গেছে তাই নয়, সর্বাধিক ও সর্বের ব্যবধানটিও অপসৃত হয়েছে। ওই বৃহত্তম

[১১] *ধর্ম্মতত্ত্ব*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১২০।

ঐক্যে যখন কেউ আপনাকে একীভূত করে, তখনই সে বলতে পারে— "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা"[১২]।

বঙ্কিমের মতে হিতবাদের আর-একটি দুর্বলতা হল, কেন দশের জন্য একজন ত্যাগ স্বীকার করবে? কেন কোটি লোকের হিতের জন্য এক লক্ষ লোকের অনিষ্ট করা হবে? হিতবাদীরা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। তাঁর মতে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। একমাত্র ভারতীয় ঐতিহ্যেই এর উত্তর নিহিত রয়েছে। মনুষ্যে প্রীতির কারণ হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ঈশ্বরে ভক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। হিন্দুর ঈশ্বর হলেন সর্ব্বভূতময় এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। একই আত্মা সকলের মধ্যে পরিব্যপ্ত এবং সকলকিছু তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত— 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা'[১৩]। কোনো মনুষ্য ঈশ্বর ছাড়া নয়, সকলের মধ্যেই তিনি বিদ্যমান। সকল মানুষকে না ভলোবাসতে পারলে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয় না। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হলে, প্রীতির কোনো অস্তিত্বই নেই। এ-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বে বলেছেন—

> যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে, সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই।[১৪]

বঙ্কিমের মতে, যে ভাবের বশীভূত হয়ে আমরা অন্যের জন্য আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তা হল প্রীতি বা পরার্থ প্রবৃত্তি। এই প্রীতি যেমন সহজ বা স্বাভাবিক হতে পারে, তেমনি সংসর্গজ হতে পারে। সন্তানের প্রতি মাতা পিতার বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের

---

[১২] শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ – ৬/১১।

[১৩] কঠ উপনিষদ – ২/২/১২।

[১৪] *ধর্ম্মতত্ত্ব*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১১৪-১১৫।

যে প্রীতি, তাই হল স্বাভাবিক প্রীতি। অপরদিকে, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, বা বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি যে প্রীতি, তাই হল সংসর্গজ প্রীতি। পরার্থ প্রবৃত্তি বা অন্যের জন্য আত্মত্যাগের প্রথমিক শিক্ষা মানুষ পরিবার থেকেই পায়। অর্থাৎ পরিবারকে কেন্দ্র করেই প্রীতি বৃত্তির সূত্রপাত। পারিবারিক অনুশীলনে এই প্রীতিবৃত্তি ক্রমশ পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনুগত, আশ্রিত ও গোষ্ঠীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। অনুশীলনের ফলে এই প্রীতি ক্রমশ নিজ গ্রাম, নগর ও দেশের মানুষ মাত্রের প্রতি নিবিষ্ট হয়। যখন আমাদের জন্মভূমির প্রতি এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন তা দেশবাৎসল্যের রূপ নেয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে এই দেশবাৎসল্য প্রীতি প্রবলভাবে লক্ষ্য করেছেন বঙ্কিম। কিন্তু তাঁর অভিযোগ ইউরোপীয়দের প্রীতি শুধুমাত্র তাদের স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সমস্ত মনুষ্যলোকসকে তা পরিব্যপ্ত করতে পারে না। বঙ্কিমের মতে, দেশবাৎসল্য প্রীতি বৃত্তির স্ফূর্তির চরম সীমা নয়, সমস্ত জগতের প্রতি যে প্রীতি, তাই হল প্রীতি বৃত্তির চরম সীমা। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্যে দেশবৎসল মাত্র"[১৫]। ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির এই ক্ষুদ্রতার প্রতি রবীন্দ্রনাথও পরে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটি লক্ষ্যণীয় তফাত তাঁর নজরে এসেছে। ছায়া শীতল ভারতভূমিতে যখন আর্যদের আবির্ভাব ঘটেছিল, তখন সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে মিতালীর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তাদের। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা সেই প্রকৃতিকে রিক্ত করে, মথিত করে আপন সুখ কেড়ে নিতে শিখেছে। প্রকৃতির প্রতি তাদের এই মনোভাব এবং সবকিছুকে উপায় হিসাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা থেকেই তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবোধ ও তীব্র জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে সমগ্র প্রকৃতির

[১৫] তদেব। পৃ. ১১৪।

লক্ষ্যের সঙ্গে আপন লক্ষ্যকে ঐক্যবদ্ধ করার মানসিকতা ভারতবাসীকে শিখিয়েছে—'বসুধৈব কুটুম্বকম্'[১৬]।

হিতবাদীরা যে সুখ বা দুঃখের কথা বলেন, সেই সুখ ও দুঃখকে আমাদের মানসিক অবস্থা মাত্র বলে অভিহিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর মতে এগুলি মানসিক অবস্থা হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন। আমাদের মানসিক শক্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন হলে কোনো দুঃখই আর দুঃখ বলে মনে হবে না। যারা শারীরিক ও মানসিক শক্তির সম্যক অনুশীলন বা পরিচালনা করে না, তারাই দুঃখী। আমাদের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তির অনুশীলনকেই বঙ্কিম ধর্ম বলেছেন এবং এর অভাবই হল অধর্ম। কিন্তু বঙ্কিমের অনুশীলনতত্ত্বের সাথে পাশ্চাত্ত্যের পার্থক্য আছে। বঙ্কিমের মতে, "বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত।"[১৭] আবার পাশ্চাত্ত্য অনুশীলনের উদ্দেশ্য যেখানে ইন্দ্রিয়সুখ লাভ, সেখানে ভারতীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য হল মুক্তি। এই মুক্তি হল সুখের অবস্থা বিশেষ, সুখের পূর্ণ ও চরম উৎকর্ষ।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভবনাকে 'বৃত্তি' নামে অভিহিত করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এ-প্রসঙ্গে তাঁর ধর্মতত্ত্বে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জনী এই চার প্রকার বৃত্তির কথা বলেছেন তিনি।[১৮] এই সকল বৃত্তি মাত্রেরই সর্বাঙ্গীণ পরিণতি না হলে, আমাদের পরিপূর্ণতা আসে না। কারণ বঙ্কিমের মতে, "ভগ্নাংশ গুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পুরা টাকাতেই কমতি হয়।"[১৯] ঈশ্বরকে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সকল বৃত্তির স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ

---

[১৬] মহোপনিষদ, ৬/৭১।

[১৭] *ধর্ম্মতত্ত্ব*, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৬।

[১৮] তদেব, পৃ. ২১।

[১৯] তদেব, পৃ. ১৭।

হিসাবে স্বীকার করেছেন। তাবে তিনি যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন, তা হল ব্যক্তি ঈশ্বর, অদ্বৈত বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বর নয়। কারণ যিনি নির্গুণ, তিনি কখনও আমাদের আদর্শ হতে পারেন না। আমরা যে যা হতে চাই, তার জন্য আমাদের সম্মুখে একটি সর্বগুণ সম্পন্ন আদর্শের প্রয়োজন হয়। সেই আদর্শ অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে একদিন ঠিক আদর্শানুরূপ না হোক, অন্তত তার নিকটবর্তী কিছু আমরা হতে পারব। বঙ্কিমের মতে, "ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্যস্বরূপ চারটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।"[২০] প্রশ্ন হতে পারে ষোল আনার বা পূর্ণতার সাধনা নিরর্থক নয় কি? কারণ পূর্ণতার ধারনাটি তো আদর্শ, আর আদর্শ চিরকাল আদর্শই থাকে; তার বাস্তবায়ন কি সম্ভব? যদি বাস্তবায়ন সম্ভব না-হয়, তাহলে সর্বকল্যাণের আদর্শ ত্যাগ করে সর্বাধিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে যারা তৎপর, তাদের দোষ দেওয়া যায় কি? বঙ্কিম কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁর বিচারে ষোল আনার সাধনা না করলে, বাস্তবে বারো আনাও পাওয়া যায় না। কাজেই ষোল আনার সাধনায় যদি বারো আনাই মেলে তাতে ক্ষতি কী। প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে বারো আনার সাধনাই বা আমরা করব না কেন? সর্বহিত কামনাই যদি সর্বাধিকের লক্ষ্য হয়, তাহলে সর্বাধিকের হিতই বাঞ্ছনীয় নয় কি? এই প্রশ্নের আলোচনা বঙ্কিম করেনি। কিন্তু বঙ্কিমকে অনুসরণ করে বলা যায় আদর্শ হিসাবে সর্বহিতের সাধনাকে না রাখলে, সর্বাধিকের হিত সাধন সম্ভব হবে না। যদি বারো আনার প্রত্যাশায় কাজ করি তাহলে বারো আনাকে লাভ করা সম্ভব হবে না।

[২০] তদেব। পৃ. ১৮।

৪.৩ উপযোগবাদী সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র মানসে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

সরাসরিভাবে হিতবাদের উপর আলোচনা বা সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। তবে তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা মন্তব্য হিতবাদের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবকেই তুলে ধরে। বৃহদায়তন শিল্প ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনবাদী মনোভাবের যে দ্রুতহারে প্রসার ঘটে চলেছে, তার প্রতি উষ্মা প্রকাশ করেছেন তিনি। এখানে বলা দরকার যদিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে ভেদরেখা টানার বা আধুনিকতার বিরোধিতা করার কোনো প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না, তথাপি ইউরোপীয় ভোগবাদী ও জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেখানে এই পৃথিবীকে গণ্ডীবদ্ধ করার, ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করার একটা প্রবণতা ছিল। পৃথিবীকে নিজের ভোগের উপায় হিসাবে দেখা এবং প্রকৃতিকে নিগড়ে নিয়ে নিজের জীবনযাত্রার উপকরণ সংগ্রহ করার একটা চেষ্টা গ্রীক সভ্যতার সময় থেকেই ইউরোপে লক্ষ্য করা গেছে। শুধু প্রকৃতিকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করেই ইউরোপ ক্ষান্ত হয়নি, সেইসঙ্গে অন্যসব জনগোষ্ঠীকে নিজ জাতির স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাই আত্ম-পরের ব্যবধান ঘোচাতে ইউরোপীয় নীতিতাত্ত্বিকরা যতই তৎপর হন, তাদের সে চেষ্টা কেবল তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। অন্যকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করাই যেখানে দস্তুর, সেখানে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ব্যবধান থাকতে বাধ্য।

অবশ্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাচ্ছন্দ্য সবদিক থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকা যে প্রাচ্যকে টেক্কা দিয়েছে, সেকথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হয়। ভাস্কর্য, কলা,

সাহিত্য, কাব্য এবং পরিশীলিত চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমী দুনিয়া যে প্রাচ্যকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে, তা রবীন্দ্রনাথ কখনও অস্বীকার করেননি। এমনকি তাঁর সাহিত্যের কদর এদেশের পাঠক উপলব্ধির আগেই ইউরোপ তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং সেই সূত্রে সাহিত্যে তাঁর নোবেল প্রাপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু বৈভবের চূড়ায় পৌঁছেও ইউরোপীয় সভ্যতা তার স্বার্থকতা লাভ করেছে বলে কবিগুরু বিশ্বাস করতেন না। তাঁর স্বীকারোক্তি— "একথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমী লোক জয়ী হয়েছে"[২১]। কিন্তু তাঁর শ্লেষ, "পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করেছে"[২২]। অর্থাৎ কিনা পৃথিবী ইউরোপের কাছে কামনা পূরণের একটা উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতি থেকে মানুষ, পৃথিবীর সবকিছু তাদের কাছে ভোগের একটা উপায় মাত্র।

পশ্চিমের বিলাসের জীবন চাক্ষুষ করার পর রবীন্দ্রনাথ যে সুখী হতে পারেননি, সেকথা নিজের কাছে রাখা তাঁর প্রশ্নোত্তরে স্পষ্ট হয়ে যায়— "... কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কী তৃপ্তি পেয়েছ?"[২৩] এই জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন— "না, পাই নি"। কিন্তু কেন ইউরোপের শক্তি, প্রাচুর্য কবিসত্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি এর ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন— "সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না।"[২৪] এখানে বলা দরকার রবীন্দ্র দর্শনে আনন্দের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই আনন্দ নিছক সুখের মধ্যে লাভ করা সম্ভব নয়। যদিও সুখ হল দুঃখের বিরোধী এক অবস্থা। যেখানে দুঃখ থাকে সেখানে সুখ থাকতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে আনন্দের অবস্থা এমন এক উচ্চতর মানসিক স্থিতি যেখানে দুঃখ, সুখ কোনোটিই

---

[২১] শিক্ষার মিলন, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (*একাদশ খণ্ড*), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৬৬৪।

[২২] তদেব।

[২৩] তদেব।

[২৪] তদেব।

পরিত্যক্ত হয় না, বরং অন্তর্ভুক্ত হয়। এই আনন্দের স্থিতিতে উত্তরণের পথে দুঃখের অবদান সুখের তুলনায় কিছু কম নয়। একটি শিশু যখন প্রথম হাঁটতে শেখে, তখন সে বারবার ব্যর্থ হয়। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে কঠিন ভূমির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে। এই ঘটনা আপাত দৃষ্টিতে দুঃখের, এমনকি নিষ্ঠুর বলেও মনে হতে পারে। মনে হতে পারে পৃথিবীর মাটি কেন এত কঠিন! অথচ পৃথিবী পৃষ্ঠ যদি কঠিন না হত, তাহলে শিশুর হাঁটতে শেখা সফল হত কি? বারংবারের ব্যর্থতার দুঃখ যে তার মধ্যে কোনো প্রভাবই ফেলে না, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তার আচরণে। একবারের সফল প্রয়াসে যখন আপন দেহকে সে তার দুই পায়ের উপর ঋজু করে তুলতে পারে, তখন তার মুখের মধ্যে যে অম্লান হাসি বিচ্ছুরিত হয়, তার মধ্যে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। এমনই এক অমলিন আনন্দের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর প্রতিটি রচনায়। 'যে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,' যে ধারা রবি, শশী সমগ্র প্রকৃতি পান করে চলেছে। ক্ষুদ্র, তুচ্ছ দুঃখ পরিহার করে সেই আনন্দের স্রোতে অবগাহনের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। জগতের আনন্দ যজ্ঞের অংশ নিয়ে মানব জীবনকে ধন্য করার সুযোগ নিতে বলেছেন। কারণ তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মনুষ্য জীবনের পরম প্রাপ্তি।

ভোগের যে রূপ রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে লক্ষ্য করেছিলেন, তার দানবীয় প্রকাশ আমেরিকাবাসীদের মধ্যেও চাক্ষুষ করেছেন তিনি। একটানা সাতমাস আমেরিকায় বসবাস করেছিলেন তিনি। আমেরিকার টাইটানিক ওয়েল্‌থ্ বা ঐশ্বর্যের দানবীয় প্রকাশ যে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন তিনি। কিন্তু সেই বিপুল আয়তন প্রবল শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি যে কল্যাণের সন্ধান পাননি, সেকথাও কবুল করেছেন—

হোটেলের জানালার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর – অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়।[২৫]

এখানে কবির বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, ঘুমিয়ে থাকা ভোগের দৈত্যকে একবার জাগিয়ে তুললে আর রক্ষে নেই; সে যত পাবে তার ভোগলিপ্সা ততই বেড়ে চলবে। সুখের জন্য সম্পদের সন্ধান করতে গিয়ে তার জীবন হয়ে দাঁড়াবে সম্পদের জন্য সম্পদ সন্ধানে। এভাবে বিষয় বুদ্ধির মাঝে আপন সিদ্ধি খুঁজতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলবে জীবনের আসল আনন্দ। মানুষ যখন তার স্বাভাবিক জীবনশৈলী থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার জীবন কীভাবে পণ্ড হয়ে যায়, তার তার নমুনা পেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন—

অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোর মধ্যে মেতে থাকা তাঁর শৈশবের একটা অভ্যেস ছিল। ওই বন্ধুদের কেউ রান্না করত, কেউ জোগাড় করত, কেউ পুতুল সাজাত, কেউ বা অন্য কিছু; সবাই মিলে মজার মধ্যেই দিন কাটাত। একদিন ওই বন্ধুদের মধ্যে একজন একটি বিরাট আকারের বিদেশী পুতুল নিয়ে হাজির হয়। সেই পুতুল আকারে যেমন বিরাট ছিল, তেমনি তা ছিল অনিন্দ্য সুন্দর। বিদেশ থেকে নিয়ে আসা ওই পুতুলটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রত্যেকেই সেটিকে ছুঁতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু যে বন্ধুটি অভিভাবক সূত্রে পাওয়া ওই পুতুলটি নিয়ে এসেছিল, সে সঙ্গীদের কাউকেই ওই পুতুলটিকে স্পর্শ করতে দিত না। এর পরের

[২৫] তদেব, পৃ. ৬৬৯।

দিনগুলিতে খেলার সময় উপস্থিত থাকলেও অন্যদের ছোঁয়া থেকে নিজের পুতুলকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকত সে, ফলে সকলের সঙ্গে স্বাভাবিক খেলায় অংশ নেওয়া হয়ে উঠত না। এভাবে বৈভবের মধ্যে আনন্দ খুঁজতে গিয়ে খেলার আনন্দই মাটি হয়ে যায় তার।[২৬]

বস্তুর মধ্যে, তার সংখ্যাধিক্যের মধ্যে বা পরিমাণগত বৃদ্ধির মধ্যে যে আনন্দ নিহিত থাকতে পারে না, তা তাঁর নানা রচনায় নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রসঙ্গে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তাঁর একদিনের অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি—

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারও হাতে ছিল মাদল, কারও হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দূন চৌদূন লয়ে লয়ে চড়তে লাগলো। রাত এগারোটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে আধিক্যের মধ্যে, যথেচ্ছ বৃদ্ধির মধ্যে কল্যাণ বা শ্রী নিহিত থাকতে পারে না। সুতরাং সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক সুখের দাওয়া যারা করেন, রবীন্দ্র মানস যে কখনই তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবে না, তা ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক। উচ্চগ্রামে অনবরত জগঝম্প বাজিয়ে চললে তা যেমন শ্রুতিকটু ও একঘেয়ে হয়ে যায়, তেমনই বিত্তের মধ্যে, বিলাসিতার মধ্যে আনন্দ খুঁজতে

[২৬] *The Religion of Man*, Rabindranath Tagore, p. 148.

[২৭] শিক্ষার মিলন, *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (*একাদশ খণ্ড*), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৬৬৯।

গেলে সেই আনন্দ প্রাপ্তি হয় সুদূর পরাহত। কক্ষের মধ্যে আলো বাতাস বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্যে শুধু কক্ষের উপর কক্ষ তুলে আকাশচুম্বী অট্টালিকা গড়ে তোলা হয়, তা হলে দেখা যায় আকাশ দূর থেকে দূরেই সরে যাচ্ছে; তা আর নাগালে আসছে না। এখানে সর্বজনবিদিত সিজউইকের হেঁয়ালিটির উল্লেখ বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না— "... the impulse towards pleasure, if too predominant, defeats its own aim"।[২৮]

রবীন্দ্রনাথ সাবেকি ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থাশীল। যে ঐতিহ্য আর্যদের হাত ধরে গড়ে উঠেছিল এই দেশে। আক্রমণকারী হিসাবে ভারতবর্ষে আর্যদের আবির্ভাব ঘটলেও এদেশের সবুজ বনানী অধ্যুষিত ছায়া শীতল পরিবেশ তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনে। প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে তোলে তারা। নিজ লক্ষ্যের সঙ্গে প্রকৃতির উদ্দেশ্য পূরণও যে একসূত্রে বাধা, সেই বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। আর এখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় আর্য সভ্যতার তফাত দেখা দেয়। 'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং'[২৯]— আর্য ঋষিরা এই উপলব্ধি লাভ করেন। পৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তোলায় এই বসুধার সবকিছুকে নিজের মিত্র ভাবার যে মানসিকতা পরম্পরা সূত্রে ভারতবাসী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছেন, তাথেকে ভোগবাদী, প্রয়োজনবাদী এবং বস্তুসর্বস্ববাদী ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন তিনি।

উপযোগবাদীরা উপযোগের নামে যার সর্বাধিকীকরণ ঘটাতে তৎপর, তা আসলে ইন্দ্রিয়সুখ। বিত্তের মধ্যে, অর্থের মধ্যে, সোনা-দানা, মণি মুক্তের মধ্যে যে সুখের সন্ধান ইউরোপ করে চলেছে, সেই সুখের প্রতি অনিহা নানা উপন্যাস ও নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ-ব্যাপারে তাঁর "রক্তকরবী" নাটকটি বিশেষ উল্লেখের

---

[২৮] *The Methods of Ethics* (7th ed), Henry Sidgwick, p.48.

[২৯] ছান্দোগ্য উপনিষদ – ৭/২৩/১।

দাবি রাখে। এটি একটি প্রতীকী নাটক; যেখানে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিকৃতরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লোভ ও ভোগ বাসনার অতিরেক মানুষকে পুরোপুরি যন্ত্রনির্ভর করে তুলছে। এই যন্ত্রসর্বস্বতা সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু মনুষ্যত্বকে পীড়িত ও অবক্ষয়িত করছে। রক্তকরবী নাটকে এই ধনতান্ত্রিক শোষণজীবী সভ্যতাকে কবি কল্পনা করেছেন যক্ষপুরীর রাজ্যরূপে। এই রাজ্যের রাজা হলেন মকররাজ, যার শোষণ ও শাসনযন্ত্রের প্রতীক হল সর্দারগণ, অধ্যাপক, গোঁসাই, মোড়ল প্রভৃতি চরিত্র। অন্যদিকে আছে খনির শোষিত শ্রমিকগণ। যক্ষপুরীর রাজা মাটির তলা থেকে তাল তাল সোনা আহরণ করে চলেছে; তার জীবন থেকে সহজ আনন্দ, প্রেম ও কল্যাণ অস্তমিত। বিশুর সংলাপের মধ্য দিয়ে কবি যক্ষপুরীর এই বাস্তব চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন— "আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে।"[৩০]

কেবলমাত্র শক্তি সঞ্চয়ের দ্বারা বস্তুবিশ্বকে অধিকার করাই উপযোগবাদী বর্তমান সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু স্তূপাকার জড়শক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরাত্মা কেবল অবরুদ্ধই হয়। ধন বৃদ্ধির উন্মত্ত নেশায় তরুণ প্রাণের নিত্য বলি ঘটে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য থেকে আমরা প্রতিনিয়ত নির্বাসিত হচ্ছি। জটিলতার জালে নিজেদেরকে নিজেরাই রুদ্ধ করছি। ফলে মানুষ ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে যে, মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা মৃত স্বর্ণ সম্পদ আহরণের তুলনায় সুজলা সুফলা শ্যামল জীবন্ত প্রকৃতির মধ্যে বহমান আনন্দের হিল্লোল হৃদয়ে অনুভব করার গুরুত্ব অনেকবেশি। প্রতাপের মধ্যে কোনো পূর্ণতা নেই, একমাত্র প্রেমই মানুষকে পূর্ণতা দিতে পারে। রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীকে উদ্দেশ্য করে রাজার বয়ানে এই বক্তব্যই ব্যক্ত হয়েছে—

---

[৩০] রক্তকরবী, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ৩৬৫।

পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠেছে, ফুল ফুটেছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।[৩১]

রক্তকরবী নাটকে রাজা তার আপন শক্তির বাহুল্যে শুধু ধনসম্পদ সংগ্রহ করেন। তার শোষণযন্ত্রের চাপে পড়ে খনির শ্রমিকরা মনুষ্যত্বহীন জড় সংখ্যা নামায় পরিণত হয়েছে— "ওদের কাছে আমরা মানুষ নই কেবল সংখ্যা"[৩২]। রাজার এই শক্তির সঙ্গে আনন্দের কোনো যোগ নেই; এই শক্তি অন্ধ ও জড়। কেবলমাত্র সঞ্চয়ের কাজে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতেই এই শক্তির সার্থকতা। যক্ষপুরীর যেসকল শ্রমিককে দিনরাত মাটির তলা থেকে স্বর্ণ আহরণের কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাদের না আছে কোনো সুখ, না আছে কোনো শান্তি, না আছে নিজস্ব কোনো আশা আকাঙ্ক্ষা; এমনকি তাদের কোনো নাম বা পরিচয়ও নেই। ধর্মের নেশায়, স্থূল সুখের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সাথে প্রতারণা করা হয়। এভাবে অপরকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করা এবং সঞ্চয়ের প্রয়োজনে মানুষকে নিছক উপায় হিসাবে ব্যবহার করার এই উপযোগবাদী মানসিকতাকে রবীন্দ্রনাথ কোনোভাবেই সমর্থন করেননি। আদর্শগতভাবে ভিন্ন বিন্দুতে অবস্থান করলেও এবং সরাসরিভাবে উপযোগবাদের বিরোধিতা না করলেও, কাল্পনিক রাজার হাতে কাল্পনিক শ্রমিকদের নির্যাতিত হওয়ার এই ঘটনা যে বাস্তবেও ঘটে চলেছে, সেকথা নানাভাবে বার বার ব্যক্ত করেছেন কার্ল মার্কস। তিনি যাদের বুর্জোয়া বলেছেন, তাদের হাতে প্রলেতারিয়েত বা শ্রমজীবীদের অবস্থানটাও একইরকম।

---

[৩১] তদেব, পৃ. ৩৬২।

[৩২] তদেব, পৃ. ৩৬৬।

প্রকৃতির সঙ্গে বস্তুবিশ্বের প্রবল সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এই রক্তকরবী নাটকে। পৃথিবীর একশ্রেণির মানুষ প্রকৃতির আশীর্বাদ ও স্নেহকে ভুলে গিয়ে অন্ধ কারাগারে, সঞ্চয়ের যক্ষপুরীতে নিজেদের বদ্ধ করে রাখে। লোভ ও সঞ্চয়ের নেশায় ধরিত্রী মাতার যাবতীয় ঐশ্বর্য দিনরাত লুট করে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতি তার সম্পদ খুশি হয়েই মানুষকে দান করে। উপযোগিতা বৃদ্ধির নামে আমরা যখন নিজেদের লোভ ও স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতির সেই সম্পদকে লুট করি, তখন আসলে নিজেদের জীবনে অভিশাপকেই ডেকে আনি আমরা। তাই রক্তকরবী নাটকে নন্দিনীর বক্তব্যের মাধ্যমে কবি আমাদের সতর্ক করে বলেছেন—

> পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস।[৩৩]

রবীন্দ্রনাথের আর-একটি প্রতীকী ছোটোগল্প হল ‘গুপ্তধন’। সোনাদানার প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ খনির মধ্যে হঠাৎ এসে পড়ে এই গল্পের নায়ক, মৃত্যুঞ্জয়। প্রথমে সেই আশাতীত স্বর্ণখনির সান্নিধ্য লাভ করে নিজেকে ধন্য মনে করে এবং ধীরে ধীরে নিজেকে পৃথিবীর অধিপতি ভাবতে শুরু করে। মুক্ত পৃথিবীর কথা বিস্মৃত হয়। কিন্তু মণি মাণিক্যের গুপ্ত খনিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার পর সে ওইসব সম্পদের অসারতা অনুভব করে। শুধুমাত্র পৃথিবীর জল, বায়ু, মাটি ও আকাশের সান্নিধ্য ফিরে পাওয়ার জন্য কাতর হতে থাকে।

---

[৩৩] তদেব, পৃ. ৩৬১।

বস্তুর মধ্যে, ভোগের মধ্যে যে প্রকৃত সুখ নিহিত নেই; তা যে ত্যাগের মধ্যে, সর্বভূতের হিতের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেকথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'Spiritual Union' শীর্ষক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, অসীমের পথে পাড়ি দিতে গিয়ে মানুষ একটা সময় বস্তু জগতের দিকেই যাত্রা করেছে। সে ভেবেছে নিজের অধিকারে পৃথিবীর তাবৎ বস্তুকে নিয়ে আসতে পারলে সে সীমাকে অতিক্রম করে অসীমে পৌঁছোতে পারবে। কিন্তু সংখ্যাগত ও পরিমাণগত সর্বাধিকিকরণের মধ্যে দিয়ে যে অসীমকে লাভ করা যায় না, তা ক্রমশ শিখেছে সে। বস্তুর চোরাবালিতে আটকে গিয়ে তার যাত্রা শুধু ব্যহতই হয়েছে। কবির ভাষায়, "But true spiritual religion is not through augmentation of possession in dimension or number."[৩৪] 'গুপ্তধন' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রের মাধ্যমেও একই কথা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, উপযোগবাদীদের মতো ইন্দ্রিয় সুখের পরিমাণগত আধিক্য ঘটিয়ে যেমন নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায় না, তেমনি কোনো অতিলৌকিক ঐশী সত্তার উপসনার মধ্য দিয়ে অসীমের সাযুজ্য লাভ করা যায় না। একমাত্র কর্মের মধ্য দিয়ে সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারলেই প্রকৃত আনন্দকে লাভ করা যায়। মুক্তাত্মা হওয়ার মধ্য দিয়ে নয়, বরং যুক্তাত্মা হওয়ার মধ্য দিয়েই পরমানন্দ প্রাপ্তি হতে পারে। বুদ্ধের আদর্শে জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে বিশ্বকর্মা হয়ে উঠতে পারলে নিজের সীমাকে হয়তো অতিক্রম করতে পারবে মানুষ।

সহযোগিতা, সমন্বয় ও সহাবস্থানের এক পরম্পরা ধূলিকণা থেকে নক্ষত্র, সকলের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ।[৩৫] একটা কয়লা খণ্ডকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা

---

[৩৪] *The Religion of Man*, Rabindranath Tagore, p. 52.

[৩৫] *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান*, শংকর সেনগুপ্ত (অনুঃ), পৃ. ২৬-২৭।

যায় সেটি নিশ্চল জমাট বাঁধা কোনো বস্তু নয়। বরং অসংখ্য কার্বন কণা, যেগুলি একটি কেন্দ্রের চর্তুস্পার্শে আবর্তিত হয়ে চলেছে। স্বতন্ত্র থেকেও সেগুলি আন্তঃসম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। একইভাবে মানব দেহের মধ্যে যে অসংখ্য কোষ থাকে, সেগুলি স্বতন্ত্র ও স্বল্পায়ু, অথচ এক অখণ্ড দীর্ঘায়ু মানুষের স্বার্থে বিনষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেগুলি কাজ করে চলে। রবীন্দ্রনাথের মতে মানব প্রজাতি এই বিশ্ব নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে না। সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তার একত্বকে উপলব্ধি করতে সে বাধ্য। এই উপলব্ধি তার মধ্যে জাগ্রত হবে— তা আগে হোক বা পরে, এই জন্মে হোক বা পরজন্মে।

৪.৪ প্রয়োজনবাদী নৈতিকতার বিরোধিতায় স্বামী বিবেকানন্দ

ইউটিলিটি তত্ত্বের অসারতা প্রমাণে যে সকল সমকালীন ভারতীয় দার্শনিক বিশেষভাবে তৎপর হয়েছেন, তাদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। যদিও সন্ন্যাসী ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিবেকানন্দের যতখানি পরিচিতি, দার্শনিক হিসাবে তাঁর পরিচিতি ততখানি নয়। তথাপি মিল বেন্থামীয় ইউটিলিটির আদর্শ যে কোনো নৈতিক আদর্শ হতে পারে না, তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্বামীজী যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, তা তাঁর দার্শনিক মনেরই পরিচয় দেয়।

উপযোগবাদ যাকে স্বামীজী 'হিতবাদ' বা 'প্রয়োজনবাদ'[৩৬] বলে অভিহিত করেছেন, তার আলোচনায় সরাসরি উপনীত হননি তিনি। ধর্ম জীবনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক কোথায়, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইউটিলিটিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশ করেছেন তিনি। মানুষ কেন ধর্মের জীবনকে বেছে নেবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে ধর্মপথ অনুসরণের তাৎপর্যই বা কী? এই সকল জিজ্ঞাসা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষত যে ধর্মকে

[৩৬] *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (*তৃতীয় খণ্ড*), পৃ. ৮৯।

কেন্দ্র করে মানুষে মানুষে বৈরিতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেই ধর্মের অনুগমন নিরর্থক নয় কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ যে দাবি করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, ধর্মবোধ ছাড়া নৈতিক জীবন যাপন সম্ভব নয়।

এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার একটি পটভূমি আছে। মানুষ কীভাবে বা কোন প্রয়োজনে ধার্মিক হল, তার সন্ধান করতে গিয়ে স্বামীজী দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের মুখোমুখি হন। প্রথমটি দাবি করে যে, পূর্বপুরুষের উপাসনা থেকেই মানুষ ধর্ম জীবনে প্রবেশ করেছে। আর দ্বিতীয়টি দাবি করে যে, ধর্মের উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রকৃতির অর্চনা। দুটি মতের সমর্থনেই যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। মৃত পূর্বপুরুষদের প্রতি ভয় বা শ্রদ্ধাবশত তার উপাসনার প্রয়াস। মিশরের পিরামিড়ের অন্তরালে থাকা মমিগুলি যেমন প্রথমটির সমর্থনে সাক্ষ্য দেয়, তেমনি গ্রিস, ব্যবিলন প্রভৃতি সভ্যতায় প্রকৃতির নানা শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে দেব-দেবীর অর্চনা দ্বিতীয় মতকে সমর্থন করে। কিন্তু বিবেকানন্দ এই দুটি মতের কোনোটিকেই সমর্থন করেনি। বরং তৃতীয় একটি মতে এই দুই যুযুধান মতের অন্তর্ভাব ঘটিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, এই দুটি উপাসনার চেষ্টাই আসলে ইন্দ্রিয়ের সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়ার মানবীয় প্রয়াসকে নির্দেশ করে। এসম্বন্ধে তাঁর উক্তি, "…which to my mind, is the real germ of religion, and that I propose to call the struggle to transcend the limitations of the sense."[৩৭]

কিন্তু ইন্দ্রিয় সীমার মধ্যেই যার বিচরণ সীমাবদ্ধ, ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রমের স্পর্ধা সে দেখায় কী করে? আর এই প্রয়াসের প্রয়োজনই বা কী? বিবেকানন্দের মতে ইন্দ্রিয়ের সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া যে অসম্ভব নয়, তা মানুষ বোঝে স্বপ্নের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। স্বপ্নের সময় তার দেহ স্থির থাকে, কিন্তু সে দেখে যে নানা স্থান পরিভ্রমণ করে চলেছে

[৩৭] Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-II), P. 59.

সে। এর থেকে সে ভাবতে শেখে যে, এই দেহকে অতিক্রম করে যাওয়ার, অভিজ্ঞতার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা তার আছে। এইভাবে মানব মনে যে সত্যানুসন্ধিৎসার অঙ্কুর জন্ম নেয়, তা তাকে গভীরতর অন্তর্লোকে চালিত করতে শুরু করে। এভাবেই জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থাকে অতিক্রম করে এক উচ্চতর মানস অবস্থায় উপনীত হয় সে। এই ভাবাবেগের অবস্থায় সে এমন পরমার্থ তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, যিনি প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নন, বরং প্রকৃতির প্রভু বা ঈশ্বর। এই ঈশ্বর অভিমুখে অভিযানই হয়ে দাঁড়ায় তার আদর্শ। কিন্তু এটি নিছক আকাশচারীর কল্পনা নয় কী? এই কল্পনার রাজ্যে পাড়ি দিয়ে মানুষের লাভই বা কী? স্বামীজীর দৃষ্টিতে আত্ম অতিক্রমণের এই নিরন্তর প্রয়াসটি যেমন নিরর্থক নয়, তেমনি ঐশী শক্তির যে কল্পনা মানুষ করে তাও অর্থহীন নয়। কারণ একটি অতিচেতনের কল্পনা ছাড়া মানুষের নৈতিক জীবন স্বার্থকতা পেতে পারে না, নীতিশাস্ত্র সম্ভব হতে পারে না।

ঠিক কী কারণে নীতিশাস্ত্র অতিচেতনে বিশ্বাসের অপেক্ষা রাখে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিবেকানন্দ। তিনি মনে করেন নীতিশাস্ত্র আমাদের যে অনন্ত শক্তি বা সুখের অভিমুখে চালিত করে, অহং-এর বিনাশ ছাড়া তা সম্ভব হতে পারে না। নীতিশাস্ত্র বলে— 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু'[৩৮]। নিজেকে পিছনে রেখে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার দাবি রাখে নীতিশাস্ত্র। ইন্দ্রিয়গুলি যেখানে আপন আপন প্রাধান্য দাবি করে, সেখানে নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিকে রাখে সবার পিছনে। জড় জগতের স্বার্থ লোপ করতে না পারলে, ত্যাগের আদর্শকে গ্রহণ করতে না পারলে, অনন্ত সুখ বা অনন্ত পূর্ণের অভিমুখে যাত্রা কখনই সফল হতে পারে না। আর এই আত্মত্যাগ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অলৌকিকের স্বীকৃতি যে এক

[৩৮] *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* (*তৃতীয় খণ্ড*), পৃ. ৮৯।

অতিচেতনের অনুভূতি ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। তাঁর এই প্রত্যয় ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন—

> we cannot derive any ethical laws from considerations of utility. Without the supernatural sanction as it called, or the perception of the super conscious as I prefer to term it, there can be no ethics.[৩৯]

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে অতিচেতনে বিশ্বাস নৈতিক জীবনের পূর্বাঙ্গ হবে কেন? বিচারশীলতা থেকে কি নৈতিকতা জন্ম নিতে পারে না? এ-প্রসঙ্গে কেউ কান্টের প্রজ্ঞাকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করতে পারেন। আবার, একধাপ এগিয়ে কেউ ইউটিলিটিতত্ত্বের উল্লেখ করতে পারেন। ইউটিলিটিতত্ত্ব দাবি করে অভিজ্ঞতার আলোকে নৈতিকতা বা নীতিবোধের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। তাই অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোনোকিছুকে বিশ্বাস নিরর্থক। কিন্তু অতিলৌকিকে বিশ্বাস ছাড়া নৈতিক জীবন কোনো ভিত্তি পেতে পারে না বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। বিবেকানন্দ তাদের সঙ্গে সহমত। কেন হিতবাদ নীতিতত্ত্ব হিসাবে গণ্য হতে পারে না, তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন, "প্রয়োজনের বিবেচনায় কোন নৈতিক নিয়ম আবিষ্কার করা যায় না।"[৪০] এই মতবাদ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মিল বেন্থামীয় মতবাদ এক অর্থে প্রয়োজনসর্বস্ববাদ। উপযোগ সৃষ্টি তথা প্রয়োজন পূরণই এই মতবাদের লক্ষ্য। যা কিছু প্রয়োজনীয় তাই নৈতিক, যার কোনো প্রয়োজন বর্তমানে দৃষ্ট হচ্ছে না, তা অনৈতিক এমন কথা বলা যায় কি? 'সত্যকথন' সব নীতিশাস্ত্রেই একটি নৈতিক বিধি হিসাবে অনুমোদিত হয়। কিন্তু এমন বহু ক্ষেত্র আছে, যেখানে সত্যকথন নিষ্প্রয়োজন। অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু প্রয়োজনীয় ক্রিয়া-কলাপ আছে,

---

[৩৯] Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-II), P. 63.

[৪০] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৯।

যাদের সঙ্গে নৈতিকতার দূর দূরান্তেও কোনো সম্বন্ধ নেই। শ্বসন, রেচন ইত্যাদি আর্ন্তযন্ত্রীয় প্রক্রিয়াগুলি মানুষের অস্তিত্বশীলতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ওই কর্মগুলি নৈতিক বা অনৈতিক বলে কখনই বিবেচিত হয় না। সুতরাং প্রয়োজনের সঙ্গে নৈতিকতার সম্বন্ধটি আকস্মিক, আবশ্যিক নয়।

স্বামীজী মনে করেন প্রয়োজনের মানদণ্ডে কোনও সর্বজনীন নৈতিক বিধি প্রণয়ন করা যায় না। ইমানুয়েল কান্ট দেখিয়েছেন যে, নৈতিক নিয়ম আসলে এক সার্বিক নিয়ম। যার উৎস হল প্রায়োগিক বুদ্ধি বা ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (Practical Reason)। যার প্রয়োগ দেশ ও কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের প্রয়োজন বা উপযোগ হল সমাজকেন্দ্রিক। এক এক সমাজের প্রয়োজন অনুসারে যদি এক এক রকম নীতিশাস্ত্র গড়তে হয়, তাহলে নৈতিক নিয়মের সার্বিকতা ব্যহত হয়। তাই বিবেকানন্দ বলেছেন—

> Any system that wants to bind men down to the limits of their own societies is not able to find an explanation for the ethical laws of mankind.[৪১]

সুতরাং যেকোনো নীতিশাস্ত্রের পরিধি মানুষের ব্যক্তিগত সমাজিক পরিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা সমগ্র মানব জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো নৈতিক নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

হিতবাদ সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক পরিমাণ হিতের কথা বলে। প্রশ্ন হল এই সর্বাধিকের হিত আমরা করব কেন? পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীদের উদ্দেশ্যে স্বামীজী প্রশ্ন করেছেন যে, "যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব না কেন?"[৪২] অন্যের হিত সাধন বড়োজোর আমাদের উপায় হতে পারে, তা তো উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদি অনন্তের অভিমুখে যাত্রা বা

---

[৪১] Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-II), p. 63.

[৪২] *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), পৃ.* ২১৪।

অতিলৌকিকে বিশ্বাস মিথ্যা কল্পনা হয়, তাহলে কোন প্রণোদন থেকে অন্যের হিত সাধন নৈতিক বলে গণ্য হবে? এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য, "নীতিশাস্ত্র তো লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় মাত্র।"[৪৩] লক্ষ্য যদি না থাকে, তাহলে আমরা কেন নীতিপরায়ণ হব? কেন আমি অন্যের অনিষ্ট না করে উপকার করব?

এখানে ইউটিলিটির সমর্থকদের মহাবাক্যটি প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা 'Greatest good for the greatest number'-এর কথা বলেছেন। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক ভালো হল কি না, তা বিচারের আগে ভালোত্বের বিচার প্রয়োজন। যে ভালোত্বের সর্বাধিক সীমায় পৌঁছোনোই তাদের আদর্শ, সেই ভালোত্ব আসলে কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে হিতবাদীদের ভালোত্ব নির্ণয়ের একটি নিরপেক্ষ মানদণ্ডকে স্বীকার করতে হবে। কারণ তাদের মহাবাক্যটি ওই ভালোত্বের মানদণ্ডকে অপেক্ষা করে। আসলে লোকহিত একটি উদ্দেশ্য পূরণ ছাড়া সার্থক হতে পারে না। বিবেকানন্দের বিচারে আত্মমুক্তি হল সেই লক্ষ্য। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"— এই আদর্শে তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস। আত্মমুক্তি ও জগৎহিতকে তিনি অনেকখানি একই মুদ্রার দুই পিঠ হিসাবে দেখেছেন। শুধু আস্তিক্যবাদী ভারতীয় দর্শনগুলি নয়, নাস্তিক বৌদ্ধ দর্শনও মৈত্রী, করুণার যে আদর্শকে গ্রহণ করে, সেই ব্রহ্মবিহারের পথ আসলে আত্মশুদ্ধির পথ। আত্মশোধনের মধ্য দিয়ে নির্বাণ লাভের পথ। আত্মা বা তার মুক্তিতে আস্থাশীল নন যে র‍্যাশনালিস্টরা, তাদের পক্ষে লোকহিতের সপক্ষে সাওয়াল করা সমস্যার।

হিতবাদী মাত্রই সুখবাদী না হলেও, অধিকাংশ ইউটিলিটিতত্ত্বের অনুগামী যাকে 'Good' বলেন, তা আসলে সুখ বলেই তারা বিশ্বাস করেন। এখন সুখ লাভই যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বিবেকানন্দের প্রশ্ন, "If happiness is the goal of

[৪৩] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৯০।

mankind, why should I not make myself happy and others unhappy?"[৪৪] সুখ এবং একমাত্র সুখই যদি সবকিছুর মানদণ্ড হয় এবং তার সর্বাধিকীকরণ যদি আদর্শ হয়, তা হলে নিজের সুখের জন্য অন্যকে দুঃখ দেওয়ার মধ্যে দোষের কিছু থাকে না। স্বামীজীও প্রশ্ন তুলেছেন যে, "...আমার নিঃস্বার্থ হওয়ার উপযোগিতা কোথায়? হিত বলতে যদি 'অধিকতম সুখ' বোঝায়, তবে স্বার্থপর হইলেই আমার পক্ষে হিত।"[৪৫] সেক্ষেত্রে পরহিত বা সর্বাধিকের হিতের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার কোনো পথই হিতবাদীদের কাছে খোলা থাকে না। বিবেকানন্দের মতে, পাশ্চত্ত্য হিতবাদ যত বড়ো মতবাদই হোক না কেন, এক্ষেত্রেও সংখ্যালঘু মানুষের স্বার্থ খুন্ন হয়। এ যেন এক শ্রেণির মানুষকে কষ্ট দিয়ে আর-এক শ্রেণির মানুষকে তুষ্ট করার চেষ্টা।

যে সুখের পরিমাণকে সর্বাধিক করে তুলতে হিতবাদীরা তৎপর, সেই সুখ বিচারের মানদণ্ড কী হবে? সুখ বিচারের কোনো সর্বসম্মত মানদণ্ড আদৌ আছে কি? এমন কোনো কিছু আছে যা সর্বদেশে, সর্বকালে, সকলের কাছে সুখকর? বস্তুত সর্বসম্মত সুখ বলে কিছু হয় না। যা একজনের কাছে সুখের, তা অন্যের কাছে সুখের নাও হতে পারে। যেমন একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে যা সুখের, বিষয়ভোগী কোন ব্যক্তির কাছে তা নয়। কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানের জন্য পার্থিব সব সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে সারাজীবন পাহাড়ের চূড়ায় কাটিয়ে দিতে পারে। অপরদিকে বিষয়ভোগী ব্যক্তির সুখ কেবল তার ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই আবদ্ধ। সুতরাং ব্যক্তিভেদে সুখের প্রকৃতি বদলে যায়। উপযোগবাদীরা সব সুখকে একসারিতে রেখেছেন। এপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

[৪৪] Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-II), P. 63.

[৪৫] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ৮৯।

...আমরা সমগ্র জগৎকে নিজের ভেবে চালিত করতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমগ্র জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ, কিন্তু আমার সুখও যে ঐ ভাবেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই।[৪৬]

স্বামীজী মনে করেন ইন্দ্রিয়সুখ হল আমাদের লভ্য সুখগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানবজীবনে ইন্দ্রিয়সম্ভোগ অপেক্ষা বুদ্ধিজ সুখ অধিক উচ্চতর। তিনি বলেছেন, "কুকুর আহার করিয়া যে আনন্দ পায়, আপনারা কেহ তাহা পাইবেন না"[৪৭]। কুকুরের সাগ্রহে খাদ্য গ্রহণের যে দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন তা দেখে মনে হয় যাবতীয় সুখ রসনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কিন্তু জীব যত নিম্ন থেকে উচ্চতর হয়, সুখের পর্যায়ও তত বদলে বদলে যায়। রসনা বা কামের সুখের তুলনায় দৃষ্টিসুখ যে উচ্চতর তা অনেকেই মানেন। আবার ইন্দ্রিয়সুখের তুলনায় মানসিক সুখ উচ্চতর। এভাবে সুখের নানা পর্যায় রয়েছে। যিনি চেতনার অত্যুচ্চে আহরণ করেছেন, তিনি সাধারণ মানসিক সুখের সীমা অতিক্রম করে গেছেন। সুতরাং সুখের কোনো সর্বজনীন মানদণ্ড হয় না, যার সর্বাধিকরণ ঘটিয়ে মানুষ নৈতিক হতে পারে।

উপযোগবাদে জগতের উপকার সাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই জগতের হিতসাধন করে আমাদের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, উপযোগবাদীরা এই প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারে না। আসলে এই মতবাদে আত্মত্যাগের সমর্থনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই স্বামীজী মন্তব্য করেছেন—

আমি যদি জগতের উপকার সাধন করি, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?.... অপরে যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, তাহার জন্য পরিশ্রম করিয়া জীবনপাত করিব? যদি সমাজ ব্যতীত অপর কোন শক্তি না থাকে তাহা হইলে আমি নিজেই সুখী হইব না কেন? যদি আইন-রক্ষীদের

[৪৬] তদেব, (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ১৫০।

[৪৭] তদেব, (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ১৮৩।

করতল হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারি, তবে আমি কেন আমার ভ্রাতৃবর্গের কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া নিজে সুখী না হইব?[৪৮]

বিবেকানন্দের মতে প্রকৃতিকে জয় করাই মানুষের লক্ষ্য। বাহ্য প্রকৃতি থেকে অন্তর প্রকৃতি সবকিছুকে জয় করার চেষ্টাই প্রকৃত মানুষের আদর্শ। যে প্রাণী যত নিম্ন স্তরের, সে ততবেশি ইন্দ্রিয়সুখে সন্তুষ্ট। কাজেই উচ্চতর প্রাণী হিসাবে মানুষের আদর্শ জড়ের মধ্যে, সুখের মধ্যে থাকতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ মন্তব্য করেছেন, "জড় যতই সুখকর হউক না কেন, মানুষ সর্বদা জড়ের চিন্তা করিতে পারে না"[৪৯] এমত অবস্থায় পরসুখের উপর গুরুত্ব দেয় যে হিতবাদ, তা মানব আদর্শের বিরোধী হয়ে যায়।

আসলে উপযোগবাদীরা যখন সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণের দাবি করেন, তখন তারা বিস্মৃত হন যে, একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার নিরিখেই তারা কল্যাণের ধারণাটিকে গ্রহণ করেছেন; যে সমাজ একটি নির্দিষ্ট দেশে, একটি নির্দিষ্ট কালে সীমাবদ্ধ। এই বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিতে বিবেকানন্দের মন্তব্য, "যে সকল সামাজিক রীতিনীতি ও কর্মধারা প্রচলিত আছে... সমগ্র মানব প্রকৃতির পর্যাপ্ত হইতে পারে না।"[৫০] বিবেকানন্দের মতে, হিতবাদের ভিত্তি অতীব সংকীর্ণ। কারণ বর্তমান কালের সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমির প্রেক্ষাপটে সকল কালের নীতি নির্ধারণ সম্ভব নয়। একটি ক্ষুদ্র কালাংশে অবস্থান করে সকল কালের মানুষের পক্ষে কোনটি উপযোগদায়ক হবে, তা নির্ধারণ করা যায় না।

হিতবাদীরা পরহিতে আত্মনিয়োগ করাকে, নিজেকে নীতিবান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় দেখেছেন। আর পরহিতের আড়ালে তারা আসলে অন্যদের কোনো

[৪৮] তদেব, পৃ. ১৭৮।

[৪৯] তদেব, পৃ. ৯০।

[৫০] তদেব।

না কোনো দৈহিক চাহিদা পূরণের কথা ভেবেছেন। কিন্তু একজন ব্যক্তির মধ্যে যেসব অভাব রয়েছে সেগুলি শুধুমাত্র দৈহিক অভাব— একথা ভাবা ভুল। দৈহিক অভাব পূরণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির অভাবকে চিরতরে দূর করা যায় না বলে মনে করেন স্বামীজী। একমাত্র জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বোধের দ্বারাই অভাবের চিরকালীন নিবৃত্তি সম্ভব, জড়বস্তু দান করে তা কখনই সম্ভব নয়। এপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—

> শরীরগত অভাব পূরণ করিয়া অপরকে সাহায্য করা মহৎ কর্ম বটে, কিন্তু অভাব যত অধিক এবং সাহায্য যত সুদূরপ্রসারী, উপকারও তত মহত্তর। ...যদি চিরকালের জন্য অভাব দূর করিতে পারা যায়, তবে তাহাই মানুষের সর্বোচ্চ সাহায্য বা উপকার। আধ্যাত্ম জ্ঞানই একমাত্র বস্তু, যাহা আমাদের সমুদয় কষ্ট চিরকালের জন্য দূর করিতে পারে। অতএব আধ্যাত্মিক সাহায্য করাই মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা। যিনি মানুষকে পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারেন, তিনিই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপকারক। ...অন্নবস্ত্রদান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর, প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহত্তর, কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন।[৫১]

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করেন যে, মানুষ যতদিন প্রকৃতির দাসত্ব করবে ততদিন সে প্রকৃত সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হবে। দুঃখ থেকে আমরা যতই পালাবার চেষ্টা করি, ততই দুঃখ বেশি বেশি পরিবেষ্টিত হই। আজপর্যন্ত মানুষ সুখী হবার জন্য যত রকম পরিকল্পনা করেছে তাতে ভালোর থেকে মন্দই হয়েছে বেশি। সুখ বা কোনও উপযোগিতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি করে মানুষের কামনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটানো কখনই সম্ভব নয়। তাই স্বামীজী মন্তব্য করেছেন—

---

[৫১] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৭৩-৭৪।

> ভিক্ষুক অবস্থায় মানুষ চায় টাকা, টাকা হইলে আবার অন্য জিনিস চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তারপর আবার অন্য কিছু চায়।... যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ যেমন আরও বাড়িতে থাকে, তেমনি তাহার বাসনাও বাড়িয়া যায়।[৫২]

আর-একটি বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিবেকানন্দ। যখন আমরা কারও উপকার সাধন করি, তখন আমরা নিজেদের কৃতার্থ মনে করি; মনে করি যে আমরা অন্যের উপকার সাধন করেছি। এই মদগর্ভ নিরর্থক বলেই মনে করেন তিনি। কারণ যেসব অনাথ, আতুর, আকিঞ্চনকে সাহায্য করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি, বস্তুত তারাই আমাদের উপকার সাধন করে। এ-ব্যাপারে স্বামীজীর সতর্কবাণী, "কোনো দরিদ্রই আমাদের এক পয়সা ধারে না, আমরাই তাহার সব ধারি; কারণ সে আমাদের সমুদয় দয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিয়াছে।"[৫৩] অপরের উপকার করতে গিয়ে আমরা আসলে নিজেদেরই উপকার সাধন করে থাকি। কিন্তু ঠিক কেন স্বামীজী এমন কথা মনে করেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, অপরের জন্য আমরা যে সকল কাজ করি, তার মুখ্য ফল হল আত্মশুদ্ধি। সদা সর্বদা অন্যের কল্যাণের চেষ্টায় ব্যস্ত থেকে আমরা আসলে নিজেদের ভোলবার চেষ্টা করি। পরোপকারমূলক প্রতিটি কার্য, সহানুভূতিমূলক প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আমরা আসলে 'ক্ষুদ্র আমি'-র গরিমা গ্রাস করার চেষ্টা করে চলেছি। এই সকল সৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করতে পারি এবং পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারি। স্বামীজী তাই বলেছেন—

---

[৫২] তদেব, (চতুর্থ খণ্ড), পৃ. ১০৫।

[৫৩] তদেব, পৃ. ১০১।

...পরোপকার করিতে যাওয়া এক সৌভাগ্যের কার্য। উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া, 'দুটো পয়সা নে রে বেটা' বলিয়া গরিবকে উহা দিয়ো না, বরং তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও যে, সে গরিব হওয়াতে তাহাকে সাহায্য করিয়া তুমি নিজের উপকার করিতে সমর্থ হইতেছ।[৫৪]

এই প্রসঙ্গে পরহিতে আমাদের যে প্রবৃত্তি তার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন—

প্রকৃতপক্ষে পরহিতৈষণার অর্থ জগতের দুঃখে কিঞ্চিত সাহায্য করা— দুঃখের উচ্ছেদ সাধন নয়। সাধারণ লোক নাম যশের প্রার্থী, এবং নাম যশোলাভের উদ্দেশ্যেই সে তাহার সমুদয় প্রচেষ্টা পরোপকার ও সৎকর্মের চাকচিক্যময় আবরণে ঢাকিয়া রাখে। অপরের জন্য কাজ করিতেছি, ভান করিয়া বস্তুতঃ সে নিজের কাজই গুছাইয়া লয়।[৫৫]

ইউটিলিটি তত্ত্বের সমর্থকরা যখন অন্যের কল্যাণ করার কথা ভাবেন, তখন স্বামীজী তার সাথে সহমত হতে পারেন না। কারণ তাঁর বিচারে অন্যের কল্যাণ আমরা কখনোই করতে পারি না, পারি কেবল নিজেদের কল্যাণ করতে এবং সেই সুযোগ আমরা এই জগতেই পেয়ে চলেছি বলে আমাদের উচিত ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। এই বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে স্বামীজীর অভিভাষণে—

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তোমার আত্মোন্নতির জন্য এই জগদ্‌রূপ একটি নৈতিক ব্যায়ামশালা দিয়েছেন, কিন্তু কখনও ভেবো না – তুমি জগৎকে সাহায্য করতে পার।[৫৬]

তবে পরোপকারকে আত্ম কল্যাণের উপায় হিসাবে ব্যাখ্যা করলেও সেই পরোপকার যে সবচেয়ে বড়ো ধর্ম তা কখনও অস্বীকার করেননি বিবেকানন্দ। এমনকি একজন বেদান্তী হয়েও মুমুক্ষু ব্যক্তির মুক্তি লাভের ইচ্ছাকে এক স্বার্থপর ইচ্ছা হিসাবে দেখেছেন তিনি।

---

[৫৪] তদেব, পৃ. ১০০।

[৫৫] তদেব (দশম খণ্ড), পৃ. ১৬৫।

[৫৬] তদেব (চতুর্থ খণ্ড), পৃ. ১৫২-১৫৩।

তাঁর মতে একমাত্র পরোপকারের মধ্য দিয়েই একজন মানুষ মুক্ত হতে পারে। যারা ধর্ম-কর্ম ও উপসনার পথে মুক্তির সন্ধান করেন এবং নররূপী নারায়ণকে উপেক্ষা করেন তাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্‌গার করে তিনি বলেছেন—

> ...পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগ-যজ্ঞ সব পাগলামো – নিজের মুক্তির ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়; আর যারা 'আমার মুক্তি', 'আমার মুক্তি' করে দিনরাত মাথা ভাবায়, তারা 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে বেড়ায়।[৫৭]

হিতবাদীরা যখন পরকল্যাণের বা সর্বাধিকের কল্যাণের মহান আদর্শ প্রচার করেন, তখন তাদের সেই আদর্শ বড়োজোর সেবার মোড়কে দয়ার আদর্শ হতে পারে, কিন্তু তা প্রেমের আদর্শ হতে পারে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার সেবা ও প্রেমের মধ্যে একটি তফাত মেনেছেন স্বামীজী। কোথাও কোথাও তিনি সেবা ধর্মের কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সর্বজীবে সেবাও এক অর্থে দয়াই। কারণ অন্যের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই ওই সেবা কৃত হয়। পক্ষান্তরে সবকিছুকে ব্রহ্ম বা আত্মার অংশ মনে করে বা আত্মবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে যখন কিছু করা হয় তখন তা প্রেমে উন্নীত হয়। বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা তাহা দয়া, প্রেম নহে। আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা যে জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম।"[৫৮]

পরহিতের কথা উপযোগবাদীদের মতো স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন। তবে হিত বলতে তিনি যেমন শুধু দৈহিক বা মানসিক কল্যাণকে বোঝেন না (সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক কল্যাণকেও বোঝেন), তেমনি তাঁর 'পর'-এর ধারণাটিও উপযোগবাদীদের ধারণার সঙ্গে মেলে না। মিল বেন্থামের কাছে এই 'পর' আসলে সংখ্যাধিক্য ব্যক্তি আর অবশ্যই তারা

---

[৫৭] তদেব (সপ্তম খণ্ড), পৃ. ৩২৯, ৩৫২।

[৫৮] তদেব, পৃ. ৩৫৯।

মানুষ। কিন্তু স্বামীজীর কাছে ওই পর মনুষ্যত্বের খণ্ডাংশ নয়; এমনকি কেবল মনুষ্য মাত্রও নয়। ব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু রয়েছে সবকিছুকেই তা অন্তর্ভুক্ত করে— মনুষ্য থেকে মনুষ্যতর, কীটপতঙ্গ থেকে গাছপালা সবকিছুকে। আর একদিক থেকে বিচার করলে ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের স্বার্থে যে হিতসাধন তা আসলে পরহিত নয়, এক হিসাবে তা আত্মহিত। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের ঐক্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ যিনি তার কাছে সকল জীবই নারায়ণের অংশ হওয়ায় পর বলে কিছু হয় না। এই বিশ্ববোধে ব্যক্তিবোধের উত্তরণ ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই স্বামীজী বলতে পারেন—

ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,

মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে এ সবার পায়।

বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৫৯]

৪.৫ ইউটিলিটিতত্ত্বের দুর্বলতা প্রদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ইউটিলিটি তত্ত্বের প্রতি সমকালীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় আমরা ইতিমধ্যে পেয়েছি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। প্রথাসিদ্ধভাবে এঁরা কেউই দার্শনিক ছিলেন না। একই কথা খাটে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ক্ষেত্রে। তিনি একজন অধ্যাপক ও সাহিত্যিক হিসাবে প্রসিদ্ধ হলেও আসলে তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। আজন্ম বিজ্ঞান সাধনা ও বৈজ্ঞানিক রচনার মধ্যে যার জীবন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও দার্শনিক চিন্তা তাঁর মনকে আকৃষ্ট করত এবং চিরায়ত দার্শনিক প্রশ্নগুলি তাঁকে ভাবাত। কেন মানুষ অন্যের জন্য কিছু করবে?

[৫৯] তদেব, (ষষ্ঠ খণ্ড), পৃ. ২৬৯।

তার পরহিতে আত্মনিয়োগের প্রণোদন কী হবে? এই জিজ্ঞাসাগুলি তাঁর চিন্তাকে প্রায়ই নাড়া দিত। রামেন্দ্রসুন্দর লক্ষ্য করেছিলেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে যে সভ্যতা গোটা ইউরোপকে গ্রাস করেছিল, সেই সভ্যতা পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশকেও গ্রাস করেছিল। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানবজীবনে যে সমৃদ্ধি, তাকে তিনি সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের আশীর্বাদে যে সভ্যতা প্রসার লাভ করেছে, সেই সভ্যতার মধ্যে যে ভোগবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মনোভাব বিকশিত হচ্ছিল, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই ভোগবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাবাদ এবং উপযোগবাদী মনোভাব আধুনিক সভ্যতাকে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে। রামেন্দ্রসুন্দর কখনই এই ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করেননি। তিনি দেখেছেন যতই বিজ্ঞানের জ্ঞানের দ্বারা মানুষ সমৃদ্ধ হতে থাকে, ততই অজ্ঞানের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময়তারও নিরসন হতে থাকে। ফলে প্রচলিত যে নীতিশিক্ষা, যা একসময় সমাজের নিয়ন্ত্রক ছিল এবং মানুষকে পরার্থ কর্মে প্রণোদিত করত, তা যেন ক্রমশ ক্ষীণতর হচ্ছে। এমত অবস্থায় মানুষ কেন পরের জন্য কিছু করবে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সমস্যার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কেন মানুষ পরার্থে আত্মত্যাগ করবে তার কিছু সম্ভাব্য যুক্তি বিচার করে দেখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর, যে যুক্তিগুলির অবতারণা মূলত সুখবাদী ও উপযোগবাদীরা করতে পারেন। এরকম একটি যুক্তি হল— মানুষ পরার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হবে এই উদ্দেশ্যে যে, যে সমাজে সে বাস করে, সেই সমাজ রক্ষা পাবে এবং তার সঙ্গীসাথীদের উপকার হবে। এককথায় জাতিরক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষার প্রয়োজনে আত্মত্যাগ ও পরহিতে কর্ম তার কর্তব্য। রামেন্দ্রসুন্দরের কথায়—

> পরার্থের জন্য স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে, নতুবা সমাজ চলিবে না, সমাজের মঙ্গল হইবে না; আর, সমাজের মঙ্গল না হইলে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরও মঙ্গল নাই। স্বার্থসাধন ব্যক্তিজীবন রক্ষার উপযোগী, পরার্থসাধন সমাজের জীবনের জন্য আবশ্যক।[৬০]

এখন প্রশ্ন হল জাতিরক্ষা, সমাজরক্ষা বা দেশরক্ষা একজন ব্যক্তির কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ইউটিলিটি তত্ত্বের সমর্থকের দিক থেকে দেখলে এর উত্তর খুব সহজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই সমাজের মধ্যে না থাকলে তার পক্ষে জীবন সংগ্রাম কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। একাকী বিচ্ছিন্নভাবে সে দুর্বল। সমাজের অন্যদের সঙ্গে সে না থাকলে নিজের স্বার্থ বা উদ্দেশ্য পূরণ তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কিনা আত্মসিদ্ধির স্বার্থেই তাকে সমাজসিদ্ধির পক্ষে অগ্রসর হতে হয়। সে যদি সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে সমাজ টেকে না। আর সমাজ না টিকলে তার পক্ষে নিজেকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কিনা পরহিতে সে যে সকল কার্য করে, তার অন্তরালে থাকে আত্মহিতের সুপ্ত বাসনা। আত্মসিদ্ধির দায়ে পরার্থে ব্রতী হতে হয় তাকে। তাঁর যুক্তিকে রামেন্দ্রসুন্দর তুলে ধরেছেন এইভাবে—

> ... যেমন করিয়াই হউক, নিজের লোকসান স্বীকার করিয়াও সমাজের সমবেত বলের নিকট মাথা নোয়াইতে হইবে; নিজের মুখের গ্রাস সময়ে সময়ে পরের মুখে না দিলে চলিবে না।[৬১]

উপযোগবাদী এই ব্যাখ্যা অনেকখানি অভিব্যক্তির নিয়মসম্মত বলে মনে হয়েছে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। কারণ অভিব্যক্তির নিয়মই হল ভালোর মূলে মন্দ, একের মন্দ না হলে অন্যের ভালো হয় না। পচন না ঘটলে যেমন ছত্রাকের উৎপত্তি হয় না, তেমনই একের ক্ষতি না হলে অন্যের লাভ হতে পারে না। লাভ ক্ষতির এই নিয়ম মানলে

---

[৬০] কর্ম্মকথা। *রামেন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃ. ৩৬।

[৬১] তদেব।

আত্মস্বার্থের বিসর্জন ছাড়া সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে না। আর সমাজ রক্ষিত না হলে, সেই সমাজকে ব্যবহার করে নিজের লাভের পথ প্রশস্ত করা যায় না। সুতরাং মানুষের পরার্থ কর্ম, সমাজসেবা সবই স্বার্থ রক্ষার তাগিদে।

আত্মহিতের উপায় হিসাবে পরহিত রক্ষার দাবি যেসব উপযোগবাদী করেন, তাদের অবস্থানও খুব একটা যুক্তিপূর্ণ বা সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি অধ্যাপক ত্রিবেদীর। তিনি স্বীকার করেন যে, জীবনের লক্ষ্যই হল সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা। 'আমি' ছাড়া যা কিছু রয়েছে সেই মানুষী, না-মানুষী সবকিছুকে 'তুমি' বলে অভিহিত করে তিনি লিখেছেন—

> তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ নির্ণয় ও সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসের নাম আমার জীবন ... তুমিই আমার একমাত্র মিত্র, আর তুমিই আমার একমাত্র শত্রু; উভয় সম্পর্কে সনাতন বিরোধ, আর উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক...।[৬২]

এখন প্রশ্ন হল এই সামঞ্জস্য বিধান কি কখনও সার্থক হয়? লাভ ক্ষতির অঙ্ক বিবেচনায় রাখলে এটা বলে দেওয়া যায় যে, 'আমি' ও 'তুমি'-র অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ সামঞ্জস্য কখনই স্থাপিত হয় না। সামঞ্জস্যবিধান যে দুরূহ ব্যাপার, তা মেনে নিতে হয়। কারণ ঠিক কতখানি ব্যক্তি নিজের জন্য রাখবে আর কতখানায় বা সে পরের জন্য করবে তার মীমাংসা জটিল ব্যাপার। ঠিক কী পরিমাণে কর্ম করলে আপন স্বার্থরক্ষা হবে? স্বার্থ-পরার্থের সীমারেখা ঠিক কোথায় হবে, উপযোগবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা বিচার করা সমস্যার। আত্মসুখের সঙ্গে পরসুখের একটা পরস্পর বর্জনকারী সম্বন্ধ রয়েছে। একটির বৃদ্ধি ঘটলে অন্যটির হ্রাস হতে বাধ্য। যদি ব্যক্তি আপন সত্তাকে সমগ্র সামাজিক সত্তারই

---

[৬২] তদেব, পৃ. ২৮।

অংশীভূত ভাবেন তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু উপযোগবাদীর লক্ষ্য হল আত্মসুখ। পরসুখের কামনা তার আসে ঠিকই কিন্তু তা আত্মসুখ বৃদ্ধির ছলমাত্র। এমত অবস্থায় কোনটিকে কতখানি বৃদ্ধি করবেন আর কোনটির কতখানি হ্রাস ঘটাবেন, তার হিসাব করা মুশকিল। সুখ পরিমাপের কতকগুলি মানদণ্ডের কথা বেন্থাম বলেন বটে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে ওই মানদণ্ডগুলিকে বিচারে রেখে ব্যক্তিসুখের বৃদ্ধি ঘটাতে গেলে সমাজরক্ষা কতখানি হবে সে প্রশ্ন থেকে যায়। অন্তত এই ব্যাপারে সর্বসাধারণের উপযোগী কোনো একটি সমাধান দেওয়া মুশকিল। সমস্যাটি ব্যক্ত করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন—

> সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা লইয়া জীবন; কিন্তু সামঞ্জস্যবিধান দুরূহ ব্যাপার; একেবারে ঘটে কি না সন্দেহ। কতটুকু নিজের জন্য রাখিব, কতটুকু পরের জন্য রাখিব, মীমাংসা সহজ নহে। পাঁচ জনের পাঁচ মত। আবার মত অনুসারে কাজ হয় না। মতের সহিত কাজের মিল নাই।[৬৩]

তাছাড়া তিনি মনে করেন কোন কাজের দ্বারা অধিক লোকের অধিক পরিমাণ হিত হবে তা নিঃসংশয়ে গণনা করার কোনও উপায় পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদে পাওয়া যায় না। এব্যাপারে উপযোগবাদীরা হয়তো মানুষের বিচারবুদ্ধির কাছেই আবেদন রাখবেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর মানুষের বিচারবুদ্ধির উপর ভরসা রাখতে পারেননি, বরং তিনি আমাদের সহজাত ধর্ম প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়—

> ...কোন্ কার্য্যে অধিক লোকের অধিক হিত, কে গণনা করিয়া নিঃসংশয়ে অবধারণ করিবে? বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস করিও না, বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করিও না সুস্থ সহজ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি,

[৬৩] তদেব। পৃ. ৩৭।

মনুষ্য যাহা স্বভাবের নিকট পাইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর কর; সে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে।[৬৪]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একটা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর সমাজ জীবন আসলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির একটা সমাহার মাত্র। প্রবৃত্তির অভিমুখ স্বার্থ আর নিবৃত্তির অভিমুখ পরার্থ। স্বার্থ ও পরার্থের, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তার মীমাংসা সহজে কখনোই হয়নি। মানুষের চরিত্র অনুসারে এই দ্বন্দ্ব নানা রূপ পায়। তাদের একটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে আনা সহজসাধ্য নয়। ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনের যে নিরন্তর বিরোধ, তা থেকেই ধর্ম ও অধর্মের ধারণা তৈরি হয়। কিন্তু উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই বিরোধের অবসান শুধু পরাহত হয়। কারণ আদর্শের বুলি আওড়ানো এক জিনিস আর সেই আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করা আর-এক ব্যাপার। দেখা যায় "উপদেশ দানে যিনি পরম সন্ন্যাসী, কাজের বেলায় তিনি ঘোর বিষয়ী।"[৬৫] সুতরাং যিনি পরসুখের আদর্শ প্রচার করেন, ব্যক্তি জীবনে তিনি হয়তো সর্বত্র স্বার্থ সন্ধান করেন। অন্যদিকে পরার্থবোধের বাণী প্রচার না করেও স্বভাবগুণে এমন অনেক কাজ অনেককে করতে দেখা যায়, যেগুলির মধ্যে পরহিতের চেষ্টা স্পষ্ট। আবার, এমনও দেখা গেছে যে, পরার্থবাদ প্রচার করতে গিয়ে অন্যের সঙ্গে কেউ বাদ বিসম্বাদ ও রক্তপাতে জড়িয়ে পড়েছেন।

'স্বার্থ বিসর্জন কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গ কর'— এই রকম গুরুগম্ভীর উপদেশ পরসুখবাদীরা দিতেই পারেন। কিন্তু এখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রশ্ন— "স্বার্থ বিসর্জন

[৬৪] তদেব, পৃ. ৫৪।

[৬৫] তদেব, পৃ. ৩৭।

করিব কেন?”[৬৬] ইঙ্গিত স্পষ্ট, সুখ লাভই যদি লক্ষ্য হয়, তা হলে কেন অকারণে পরকল্যাণে সেই সুখ ত্যাগ করব? এর যেসব উত্তর পাশ্চাত্ত্য বা ভারতীয় পরবাদীরা দেন, তা রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়নি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিকে যথাক্রমে ‘অধর্ম’ ও ‘ধর্ম’ গণ্য করে উপযোগবাদীরা পরার্থ প্রবৃত্তির সপক্ষে যা বলবেন তার একটি কাল্পনিক ছবি এঁকেছেন রামেন্দ্রসুন্দর— “ধর্ম্ম আচরণ কর, সুখে থাকিবে। ধর্ম্মের পথ কন্টকাকীর্ণ; প্রথমে দুঃখ আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুখ। .... ভবিষ্যৎ সুখের জন্য বর্ত্তমান দুঃখে ভয় পাইও না।”[৬৭] কিন্তু ধর্মাচরণের পক্ষে এ-ধরনের সাফাই অধ্যাপক ত্রিবেদীর কাছে সন্তোষজনক বলে মনে হয়নি। ধর্ম পন্থার ছদ্মবেশে যারা সুখবাদেরই অনুশীলন করেন, তারা আসলে পরার্থ প্রবৃত্তিকে স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে দেখেন। এই শ্লেষাত্মক উক্তির মধ্য দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর যেকথা বলতে চেয়েছেন, তা হল, পরসুখবাদী উপযোগবাদীদের কাছে পরসুখ নিশ্চিত করা আদর্শ নয়, বরং আত্মসুখ নিশ্চিত করাই লক্ষ্য। অর্থাৎ অন্যদের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে তার বিনিময়ে আত্মস্বার্থ রক্ষাই এদের লক্ষ্য। এরকম উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে নৈতিক বিচারের মর্যাদা দিতে রামেন্দ্রসুন্দর গড়রাজি। যদিও আত্মসুখের জন্য পরহিতের এই পন্থা মনের কাছে গ্রহণযোগ্য, তথাপি এটা কতদূর ধর্ম বা নীতিসম্মত সে ব্যাপারে রামেন্দ্রসুন্দর সন্দিহান।

ভবিষ্যৎ সুখের প্রলোভনে বর্তমানে স্বার্থত্যাগ হয়তো দূরদর্শী নীতি হিসাবে গণ্য হতে পারে; কিন্তু এর দূরদর্শিতা যেমন নৈতিকতার অনুমোদন পায় না, তেমনি বাস্তবে সবক্ষেত্রে ফলদায়কও হয় না। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সুখবাদী উপযোগবাদীদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক ত্রিবেদীর প্রতিক্রিয়া, “প্রলোভন দেখাইয়া কাজ পাওয়া যায়, এ হিসাবে

---

[৬৬] তদেব।

[৬৭] তদেব।

বুদ্ধিমানের উপযুক্তও বলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রলোভনটা প্রলোভন মাত্রই; ধর্ম্মপথে সুখ লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; কষ্ট পাওয়াই সার হয়; ফললাভ সর্ব্বদা হয় না।"[৬৮] শুধু পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীদেরই নয়, ভারতীয় সেইসব ধর্মবেত্তা, যারা ধর্মাচরণকে সুখ লাভের হেতু হিসাবে ব্যাখ্যা করেন, এবং ভবিষ্যৎ সুখী জীবনের ছবি এঁকে বর্তমানে ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের প্রলোভন দেখান, তাদেরও একহাত নিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বক্তব্য, 'যথা ধর্ম তথা জয়' বলে যতই প্রচার করা হোক; ধর্ম সর্বত্র জয় আনে না। ধর্ম যদি সর্বত্র জয় নিয়ে আসত, তাহলে উপদেশের এত বাড়াবাড়ি থাকত না। প্রলোভনের মাত্রা চড়াতে সুখ লাভের আশাকে ইহজীবনে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাকে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রসারিত করতে সচেষ্ট ভারতীয় ধর্মবেত্তাদের অনেকে। তাঁরা ধর্মের জয়গান এবং অধর্মের বীভৎসতাকে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন, তার নমুনা পেশ করেছেন অধ্যাপক ত্রিবেদী, "ধর্ম্মপথে চল, পরকালে সুখে থাকিবে। পরকালের সুখ নানাবিধ; - স্বর্গ, নন্দনকানন, পারিজাত, অপ্সরা, ইন্দ্রত্ব।"[৬৯] কেউ বা দেবত্ব লাভ, মুক্তি বা নির্বাণের মতো উচ্চতর সুখের প্রলোভন দেখান। কেউ আবার ধর্মচ্যুতির বীভৎস পরিণাম স্মরণ করিয়ে দেন— "উপদেশমত কাজ কর ভালই, নতুবা পরকালে ঠকিবে। রৌরব, কুম্ভীপাক, ডাঙ্গেশ, গন্ধকের আগুন; অগত্যা ন্যূনপক্ষে পুনর্জন্ম।"[৭০] এভাবে ভবিষ্যৎ সুখের হাতছানি বা দুঃখ নিবৃত্তির কথা বলে নৈতিকতা বা ধর্মের পথে মানুষকে অনুগমন করতে যারা বলেন, সেই ভারতীয়দেরও ইউটিলিটি তত্ত্বের অনুগামীদের মতো একই শ্রেণিতে ফেলেছেন অধ্যাপক ত্রিবেদী। তিনি দেখিয়েছেন সর্বজন সমক্ষে এই নীতিকথা যতখানি

[৬৮] তদেব।

[৬৯] তদেব। পৃ. ৩৮।

[৭০] তদেব।

গ্রাহ্য বলে মনে হয়, কার্যকাল সমুৎপন্ন হলে তা আর ততখানি গ্রহণযোগ্য থাকে না। সেখানে যে যার পথে নিজ নিজ মতে অগ্রসর হয়।

কেউ কেউ আছেন যারা সুখ বা শান্তির অজুহাতে নৈতিকতার পথে চলার নির্দেশ না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়েন। তাঁরা বলতে চান ধর্মাধর্মের কথা সমাজের স্বার্থেই। যেখানে সমাজ নেই; যেখানে ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টিকৃত হয়ে সমাজ জীবনে পরিণত হয়নি, সেখানে ধর্মাধর্মের অস্তিত্বই নেই। যেখানে সমাজ সেখানে পরতন্ত্রতা, পরাধীনতা ও পরের জন্য আত্মত্যাগ আসে। এভাবে যা সমাজ রক্ষার অনুকূল, তা ধর্ম বা নৈতিক বলে গণ্য হয়। আর যা তার প্রতিকূল, তা হয় অধর্ম বা অনৈতিক। যে সমাজে ধর্ম বা নৈতিকতা রয়েছে, তার গতি ঊর্ধ্বমুখী। আর যে সমাজে অনৈতিকতা ও অধর্মের প্রাবল্য, তা অধোমুখী। এই যুক্তিতে যারা নৈতিকতার পথে মানুষকে প্রবৃত্ত হতে বলেন, তারা আসলে সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন। এদেরও ইউটিলিটি তত্ত্বেরই আর-এক অনুগামী হিসাবে দেখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এদের বক্তব্যকে তিনি তুলে ধরেছেন খানিকটা শ্লেষের সঙ্গে—

> ... প্রবৃত্তি নিরোধ কর, তাহাতে ভাল হইবে। তোমার ভাল হইবে, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, তবে আমাদের ভাল হইবে। আমাদের ভাল হইলে কতকাংশে তোমারও ভাল। সেই পর্য্যন্ত তোমার পক্ষে প্রলোভন। অন্য প্রলোভন তোমাকে যা দিই, সেটা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। সেটা আমাদের পলিসি। পরের মন্দ করিও না, করিলে শাস্তি দিব; পরের ভাল করিও, তোমাকে সুশীল বলিব।[৭১]

এই ধরনের সাফায়ের মধ্যে যে যুক্তি আছে এবং সরলতা আছে, তা অস্বীকার করেন না অধ্যাপক ত্রিবেদী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাভ ক্ষতির গণনাও যে আছে, অর্থাৎ

[৭১] তদেব। পৃ. ৩৯।

ইউটিলিটির বিবেচনাও যে আছে, সেটা মেনে নিতে হয়। আর এখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের যত আপত্তি। লাভ-ক্ষতির বিচারকে বিবেচনায় রেখে কোনো নীতিতত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে না। একমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে উৎসারিত যেসকল পরার্থ প্রবৃত্তি তাদেরই নৈতিক বা ধর্ম বলে গণ্য করতে রাজী তিনি। এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য শ্রীমদ্ভগবতগীতার ভাবধারায় পুষ্ট—

> ধর্ম্ম আচরণ কর; কেন না ধর্ম্ম আচরণ কর্ত্তব্য। সুখের আশা করিও না; সুখ অনিশ্চিত। দুঃখ দেখিয়া ডরাইও না; দুঃখ জীবনের সহচর। এই কর্ম্ম কর্তব্য, এই মাত্র বোধে ধর্ম্মাচরণ কর; ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না।[৭২]

যারা বৌদ্ধিক বা যুক্তিভিত্তিক নৈতিকতার কথা প্রচার করেন, সেই ইউটিলিটারিয়ানদের অবস্থান যে কখনই বিজ্ঞানী সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দরের সমর্থন পেতে পারে না, তা তাঁর এই অবস্থান থেকেই স্পষ্ট।

৪.৬ সর্বাধিকের কল্যাণ প্রসঙ্গে সর্বোদয়বাদী গান্ধীজী

হিতবাদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেসকল সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী অন্যতম। তিনি ইউটিলিটি তত্ত্বের যেরূপ সমালোচনা করেছেন, তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে যে, গান্ধীজী কোনো প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং জননেতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা পরাধীন ভারতবাসীর মনে একটি শ্রদ্ধার আসন তৈরি করে দিয়েছে। তবে প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক না হয়েও চিন্তার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিকতার সাক্ষ্য তিনি রেখেছেন। আধুনিক সভ্যতার বিরোধিতা, পুঁজিবাদ ও শিল্পায়নের বিরোধিতা প্রভৃতি ঘটনা চিন্তক হিসাবে গান্ধীজীকে যেমন ব্যতিক্রমী করে

[৭২] তদেব।

তোলে, তেমনই অহিংসা, স্বরাজ, সত্যাগ্রহ, স্বদেশী, পঞ্চায়েতীরাজ ও সর্বোদয়ের ধারণাগুলি তাঁর চিন্তার অনন্যতাকে প্রকাশ করে। তিনি যেমন ভোগবাদ, পুঁজিবাদের বিপক্ষে ছিলেন, তেমনি উপযোগবাদেরও তীব্র বিরোধী ছিলেন। শুধু স্বদেশীয় ভাবনা নয় বলেই যে তিনি মিল বেন্থামীয় তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি তা নয়; ইউটিলিটি তত্ত্ব একটি ভ্রান্ত দর্শন বলেও তাঁর মনে হয়েছে।

গান্ধীর নীতি চিন্তার নিগড় প্রোথিত রয়েছে তাঁর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। সকলকেই ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে দেখেছেন তিনি। সুতরাং সকলেরই উন্নতি বা কল্যাণ সাধন তাঁর কাছে কাম্য বলে মনে হয়েছিল। বিত্তবান শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে হতদরিদ্র অশিক্ষিত সকলেরই যে উন্নয়ন বা উত্তরণ প্রয়োজন— এই ভাবনাই সর্বোদয়ের ধারণার অভিমুখে চালিত করেছে তাঁকে। এই সর্বোদয়ের ধারণার পাশে উপযোগবাদের ধারণাটি নেহাতই নিম্নমানের। কারণ এই উপযোগবাদ না মানুষকে মর্যাদা দেয়, না তার মনুষ্যত্বকে গুরুত্ব দেয়।[৭৩] গান্ধীর ভাষায় বলা যায়—

> অহিংসার একজন পূজারী কখনই উপযোগবাদী সূত্রকে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ কিনা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শ কোনো অহিংসার পূজারির আদর্শ হতে পারে না। তার আদর্শ হল সর্বজনের হিত সাধনের আদর্শ, যে আদর্শ রক্ষার স্বার্থে তিনি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। নিজের জীবন বাজি রেখেও তিনি অন্যের সেবায় সদা ব্রতী থাকেন।[৭৪]

আবশ্য হিতবাদীরা যখন সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলেন, তখন সরাসরিভাবে গান্ধী তাতে আপত্তি জানাবেন না। কারণ তাঁর আদর্শ যে সর্বজনের হিত, সর্বাধিকের হিত তারই মধ্যে অন্তর্গত হয়ে যায়। সুতরাং গান্ধীজীর দৃষ্টিতে যিনি

---

[৭৩] *The Philosophy of Gandhi*, Glyn Richards, p.74.

[৭৪] *Sarvodaya*, M.K. Gandhi, p. 4.

অহিংসার পূজারি, তিনি উপযোগবাদীদের সাথে অনেক বিষয়ে একমত হবেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তাদের পথ আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য। একটা জায়গায় এসে তা বিপরীত অভিমুখ নেবে। একজন উপযোগবাদীর কাছে যদি অন্যের হিতসাধন আত্মসংগতিপূর্ণ না-হয়, তাহলে তিনি কখনই আত্মোৎসর্গের পথে যাবেন না। অর্থাৎ কিনা অন্যের হিত উভয়ের লক্ষ্য হলেও উপযোগবাদীদের কাছে পরহিত নিজহিতের উপায় মাত্র। পরের স্বার্থে আত্মত্যাগ তিনি করেন না; তার আত্মত্যাগ আত্মরক্ষার স্বার্থেই। কাজেই কোনো অবস্থাতেই অন্যের কল্যাণ ভাবনায় নিজেকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করা তার লক্ষ্য হতে পারে না। তাই কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি আত্মবিসর্জন দেবেন না। অথচ যিনি অহিংসার নিষ্ঠাবান অনুগামী, তিনি তার আদর্শ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও রাজি। কাজেই শুধু যে কল্যাণের ব্যাপ্তির প্রশ্নে গান্ধী মিল বেন্থামের থেকে পৃথক অবস্থান নেন তাই নয়, কল্যাণের গভীরতার বিচারেও তার অবস্থান হিতবাদীদের থেকে আলাদা। যে কল্যাণবোধ অহিংসার পূজারিকে পরহিতে প্রণোদিত করে, তা কোনো হিতবাদীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

নৈতিকতাকে সবকিছুর মূল বলে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন গান্ধীজী। তাই উচ্চশিক্ষায় তিনি আস্থাশীল ছিলেন না, বরং যে বুনিয়াদী শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন করে, সেইটুকুই জাতির পক্ষে যথেষ্ট বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত নৈতিকতাবোধ এবং সত্যের আদর্শ। এবং সত্যবোধ তাঁর সমাজ ভাবনা এবং লোকহিতের ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ভারতবর্ষ যে সংকটের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে, তা তাঁর মতে নৈতিকতার সংকট। বিশেষত ধর্মে মানুষের বিশ্বাস হারানোর ফলে নৈতিকতার যে অবক্ষয় হচ্ছে, তা তাঁকে উদ্‌বিগ্ন করত। সাবেকি হিন্দু ধর্মে নীতিবোধ, বৈবাহিক সম্বন্ধ, স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত ও বিচারমূলক

আলোচনা তিনি করেছেন। ভারতবাসীর মধ্যে সময়ানুবর্তীতার অভাব, পত্রের উত্তর না দেওয়ার স্বভাব, অপচয় করার প্রবণতা, দরিদ্র ও দুর্বলদের প্রতি অবহেলা, সামাজিক অসাম্য— এসবের কঠোর সমালোচনাও করেন তিনি। কাজেই ভারতীয় ব্যবস্থায় যা কিছু রয়েছে সবই উত্তম, এরকম ধারণা তিনি পোষণ করতেন না। রাজনৈতিক সংকটের পাশাপাশি ভারতবর্ষ যে নৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তা তিনি জানতেন। এবং এও মানতেন যে, রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতার একটা গভীর যোগ রয়েছে। কাজেই রাষ্ট্রনীতিকে নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারটিকে তিনি কখনই অনুমোদন করেননি। এ-ব্যাপারে নিজের রাজনৈতিক গুরু গোখলের সঙ্গেও তিনি একমত হতে পারেননি। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, গোখলে অপরাপর চিন্তাবিদদের মতো রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম তথা নীতিবোধ থেকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর কাছে কিন্তু রাজনীতি এবং নীতিবোধ অবিচ্ছেদ্য।

গান্ধীজীর কাছে প্রকৃত রাজনৈতিক কর্মীর কর্মক্ষেত্র হবে গ্রাম্য ভারত; যেখানে রোগ, ক্ষুধা, স্থানীয় অবিচার এসবের বিরুদ্ধে পুরুষ ও স্ত্রী লোকেদের সাহায্য করা এবং তাদের মধ্যে সাহস, আত্মসম্ভ্রম জাগিয়ে তোলা, স্থানীয় মানুষকে ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে আসা, এককথায় সাহসী ও শক্তিশালী ন্যায়রাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলাই হবে আদর্শ। এভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে নীতি বা নৈতিকতার সংমিশ্রণ যেমন ঘটিয়েছেন, তেমনি তাকে যুক্ত করেছেন ধর্মের সাথে। তাঁর আত্মজীবনীতে গান্ধীজী লিখেছেন— “The essence of religion is morality” অর্থাৎ নৈতিকতা হল ধর্মের প্রাণ। অন্যদিকে রাষ্ট্রনীতির চালক হল নৈতিকতা। কাজেই ধর্ম ও নীতির সঙ্গে রাষ্ট্রতত্ত্বের সম্বন্ধ নিবিড়। ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা অনেকেই বলে থাকেন। তাদের বিচারে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ায় বিধেয়। কিন্তু গান্ধীজী ধর্মের সাথে রাষ্ট্রতত্ত্বের বিভেদ

কখনোই অনুমোদন করেননি। এ-ব্যাপারে ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণাণও গান্ধীজীর সাথে একমত হবেন। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism)-কে তিনি একটি বিপদজ্জনক প্রবণতা হিসাবে দেখেছেন। বিশেষত ভারতীয় পরম্পরায় ধর্ম ও নীতিবোধ এত গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে, এখানে কাউকে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে বলার অর্থ তাকে নীতিবিযুক্ত হতে বলা। কিন্তু কোনো সমাজ ব্যবস্থা কখনও নীতিবিযুক্ত হতে পারে না। গান্ধীজী মনে করেন প্রকৃত ধার্মিকের রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার পরিবর্তে প্রয়োজন রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

গান্ধীজীর নীতিবোধ ও রাজনৈতিক বোধ তাঁর পারিবারিক পরম্পরা থেকে পাওয়া। পিতাকে তিনি দেখেছিলেন সাহসী, সত্যবাদী ও উদারচেতা এক মানুষ হিসাবে। তাঁর সহজ সরল যে জীবনাদর্শ, তা পিতৃ পরম্পরা থেকেই প্রাপ্ত। বৈষ্ণব ধর্মের এক নিষ্ঠাবান অনুগামী পিতার আদর্শই তাঁকে অহিংসা বোধে উদ্‌বুদ্ধ করে। গান্ধীর জীবনের লক্ষ্য যদি হয় সত্য; তাঁর নৈতিক জীবনের লক্ষ্য নিছক ভগবান প্রাপ্তি বা ঈশ্বর প্রাপ্তি ছিল না, তা ছিল সত্য প্রাপ্তি। সত্যকে তিনি ঈশ্বরের মর্যাদা দিয়েছিলেন আর অহিংসা ছিল ওই সত্যরূপ ঈশ্বরে উপনীত হওয়ার সেতু। তবে এখানে লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে কোনো উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। সত্যের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গেলে যেমন অহিংসার পথই একমাত্র পথ, তেমনই যে পথ অহিংসার, তা কখনই সত্য ছাড়া অন্যকিছুতে পৌঁছোতে পারে না। অর্থাৎ উপায় এখানে উদ্দেশ্যকে নির্ধারণ করে দেয়। একটি মুদ্রার দুটি পিঠের মধ্যে সচরাচর আমরা 'শীর্ষ' ও 'পুচ্ছ' এভাবে ভেদ করি। কিন্তু গান্ধীজীর কাছে সত্য ও অহিংসার মধ্যে কোনো উচ্চ-নীচ ভেদ নেই।

কাজেই গান্ধীজীর নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সত্য আর উপায় ছিল অহিংসা। তবে এই অহিংসা শুধু হিংসা না করার একটি নেতিবাচক জীবনপথ নয়; এর অন্তরে নিহিত আছে প্রেমের বোধ— সবাইকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখার এক ব্রত। এই ব্রত যতখানি নিষ্ঠার সাথে মানুষ উদ্‌যাপন করতে পারবে, সে ততখানি সত্যের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারবে। এভাবে নিজের জীবনকে সত্য প্রয়োগের একটি পরীক্ষাগার হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজী। তাই নিজের জীবন আলেখ্যের শিরোনাম তিনি রেখেছেন— *The Story of My Experiments with Truth*। এই সত্য ও অহিংসার বোধ যার ভাবের মধ্যে প্রকট, তিনি যে গীতোক্ত অনাসক্ত কর্মের পথকে জীবনপথ হিসাবে বেছে নেবে, তা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কর্তৃত্বের অভিমান শূন্য হয়ে ফলের অভিসন্ধি মুক্ত হয়ে নিষ্কামভাবে কর্ম করার আদর্শ, গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল গান্ধীজীকে। এই প্রভাব যে কতখানি ছিল, তা গীতার উপর লেখা তাঁর ভাষ্য থেকেই স্পষ্ট হয়। এই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ অনুসরণ করে চললে জীবন থেকে জীবনান্তরে পরিভ্রমণের ক্লেশ থেকে জীব মুক্ত হতে পারবে— এই হিন্দু আদর্শে গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলেন তিনি। তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সেই বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

গান্ধীর অদ্বৈতবাদী ধর্মবোধ এবং অহিংসার ভাবাদর্শ দুই মিলেমেশে জন্ম নিয়েছে তাঁর সর্বোদয় ভাবনার। জন রাস্কিনের *Unto This Last* গ্রন্থটি গান্ধীর ভাবনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রাস্কিন উপলব্ধি করেন ব্যক্তিকল্যাণ সর্বকল্যাণের মধ্যে নিহিত। এই ভাবনা গান্ধীর চিন্তায় নাম পেয়েছে 'সর্বোদয়'। সর্বোদয় অহিংসা আদর্শেরই প্রতিসঙ্গী। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই বিশ্বাস যে, একের কল্যাণের বিনিময়ে অন্যের উন্নতি ঘটতে পারে না। এই ধারণার ভিত্তিভূমি গঠন করেছে এই প্রত্যয় যে, সত্য

আসলে অখণ্ড ও এক। সেই সত্যের সঙ্গে আত্মার রয়েছে ঐক্য। অস্তিত্বশীল যা কিছু আছে, তা একই সত্যের বহুধা প্রকাশ মাত্র। বহুর কল্যাণসাধন না করে এককে লাভ করা যায় না। তাই প্রয়োজন সকলের হিতসাধন। এই সকলের উদয়ের আদর্শই হল সর্বোদয়। সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণ বা হিত সংঘটিত করে ওই সর্বোদয়কে কার্যকর করা যায় না।

গান্ধীজীর এই অবস্থান থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি উপযোগবাদকে বর্জন করেছিলেন। জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় কোনো সন্তোষজনক তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গান্ধী ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একজন কাণ্ডারী। অন্যদিকে উপযোগবাদের প্রবক্তা জন্ স্টুয়ার্ট মিল ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিযুক্ত একজন কর্মচারী। আর যে উপযোগবাদী নীতি তিনি সমর্থন করতেন, সেটা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অনুমোদিত দর্শন। তাই গান্ধীর দিক থেকে উপযোগবাদের বিরোধিতা ছিল নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানেই প্রসঙ্গ এসেছে, একটি অমানবিক দর্শন হিসাবে উপযোগবাদকে নির্দেশ করেছেন তিনি। উপযোগবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ঠিক কেমন ছিল, তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর নানা উক্তির মধ্যে।

উপযোগবাদীদের সঙ্গে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গিগত মৌলিক পার্থক্য আছে। সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বার্থে সংখ্যা লঘিষ্ঠের ক্ষতিসাধন বা হিংসা উপযোগবাদীরা অনুমোদন করেন। এমনকি সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বার্থে কতিপয়ের হত্যাকেও তারা মেনে নেবেন। কিন্তু সর্বোদয়ের ঐতিহ্যে আস্থাশীল গান্ধীজী কখনোই একের স্বার্থের বিনিময়ে অন্যের স্বার্থরক্ষা অনুমোদন করেন না। হত্যা বা জীবনের ক্ষতিসাধন— তা যত অল্প সংখ্যকেরই

হোক না কেন, গান্ধীর দৃষ্টিতে তা হিংসাই। তাই সর্বাধিকের স্বার্থে কতিপয়ের উপর হিংসা তাঁর তত্ত্ব অনুমোদন করে না। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে হত্যা বা জীবনহানিকে যে তিনি অনুমোদন করেননি তা নয়। এখানে অহিংসার জৈন আদর্শের সঙ্গে গান্ধীবাদী অহিংসার একটি লক্ষণীয় তফাত আছে। জৈন নীতিতত্ত্ব কোনো পরিস্থিতিতেই কোনোরূপ হত্যা বা জীবনহানি অনুমোদন করে না। কিন্তু এই চিরাচরিত আদর্শ বাস্তব জীবনে অনুসরণ করা যে সম্ভব নয়, তা গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তাই কিছু ক্ষেত্রে হত্যাকে ছাড় দিয়েছিলেন তিনি। প্রজাতি রক্ষার স্বার্থে, খাদ্য-খাদক সম্বন্ধের তাগিদে কিছু জীবনহরণ যে অনিবার্য তা তিনি মেনে নেন। কোনো দুর্বৃত্ত যখন ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাতে অন্যদের একের পর এক হত্যা করতে থাকে, তখন তাকে নিবৃত্ত করার উপায়ান্তর না থাকলে জনস্বার্থে তাকে যে হত্যা করে, তাকে বীর হিসাবে অভিহিত করতেও গান্ধীজীর কোনো আপত্তি নেই। এক-শ্রেণির দুর্বিনীত বাঁদরের হাত থেকে যখন কোনোভাবেই সবরমতী আশ্রমের শাক-সবজি, ফলমূলকে রক্ষা করা যাচ্ছিল না, তখন তাদের হত্যাও তিনি অনুমোদন করেছিলেন। এমনকি তাঁর অনুগামীদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে একটি নিরাময়ের অযোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত যন্ত্রণাকাতর একটি গোবৎসের জীবনাবসান ঘটাতে চিকিৎসকের সাহায্যও নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর বিচারে এদের কোনোটিই হিংসা ছিল না। ক্রোধ, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদির দ্বারা চালিত হয়ে যে জীবনহানি বা জীবনের ক্ষতিসাধন, তাকে তিনি হিংসা বলেছেন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে হত্যার মূলে ক্রোধ, হিংসা বা স্বার্থসিদ্ধির মতো কোনো অনৈতিক কারণ ছিল না। তাই এগুলো তাঁর মতে হিংসা নয়।

উপযোগবাদের সমর্থক সর্বজনের উদয়ে বা সর্বহিতে গান্ধিবাদী আদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন যে, সর্বজনের উদয় বা হিতসাধন বাস্তবে কখনই সম্পন্ন হতে পারে

না। তাই সর্বোদয়ের আদর্শটি বাস্তবোচিত কোনো আদর্শ নয়, পরিবর্তে যত বেশি সম্ভব তত বেশি মানুষের হিতসাধনের দিকে মনোনিবেশ করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কোনো গান্ধিবাদীর পক্ষে এই যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোদয়ের আদর্শকে সফল করার স্বার্থে নিজের জীবনকে বাজি রাখতেও তিনি রাজি। কিন্তু সহজলভ্য ও বাস্তবোচিত বলে সংখ্যাধিক্যের স্বার্থরক্ষার নামে কিছু মানুষের প্রতি অন্যায় করার মতো দুর্ভাগ্যজনক সমাধান মেনে নিতে তিনি রাজি হবেন না। একথাও ঠিক যে সর্বোদয়ের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা আছে। সর্বাধিক সংখ্যকের স্বার্থরক্ষা বহুক্ষেত্রেই বাস্তবোচিত পদক্ষেপ বলেই আমাদের মনে হয়। কিন্তু তাই বলে কোনো পরিস্থিতিতেই কিছু জনের প্রতি হিংসার বিনিময়ে অধিকাংশের স্বার্থরক্ষাকে অনুমোদন করতে কোনো গান্ধিবাদী চাইবেন না। যিনি অখণ্ড সত্যের ধারণায় আস্থাশীল, তার কাছে মনুষ্যত্বের খণ্ডীকরণ চূড়ান্ত অন্যায় কাজ।

৪.৭ নৈতিকতার সংখ্যায়নের প্রসঙ্গ এবং শ্রীঅরবিন্দের কঠোর প্রতিক্রিয়া

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে যেসব সমকালীন ভারতীয় মনীষী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অনেকখানি অতিবাহিত হয়েছে বিলাতে। বাল্যকালে তিনি দার্জিলিং-এর লরেটো কনভেন্ট স্কুলে দুবছর পড়াশোনা করেন, তারপর ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তিনি ম্যাঞ্চেস্টার শহরে যান। ১৮৮৪ সালে লন্ডনে সেন্ট পলস স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের পাঠ শেষ করে ১৮৯০ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচিতি ছিল না। হেগেলের রচনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রথম দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। এমন এক চিন্তাবিদের ভাবনায় ইউটিলিটি তত্ত্বের

প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে মিল বেন্থামীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। উপনিষদের ভাষ্য, হিউম্যান সাইকেল ইত্যাদি নানা রচনায় উপযোগবাদের দুর্বলতার দিকগুলি প্রকট করেছেন তিনি।

শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য করেছেন, বিচারশীল জীব হিসাবে মানুষের একটা প্রবণতা হল জ্ঞেয় বিষয়কে তার বৌদ্ধিক ধ্যান ধারণার অধীনে আনা। জগৎ ব্যবস্থাকে বুদ্ধিসহ বিচারসহ করে না ফেলা পর্যন্ত তার যেন শান্তি নেই। এই একই প্রবণতা নৈতিকতার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। নৈতিক জীবনকে যুক্তি বিচারের আওতায় আনতে চেয়েছে সে। প্রাকৃতিক ঘটনাকে যেমন যুক্তি বিচারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে নানা ধরনের বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে, সেভাবে মন রাজ্যের ঘটনাগুলিকে তন্ত্রবদ্ধ করতে গিয়ে সে রচনা করেছে মনোবিজ্ঞান। একইভাবে সে তার নৈতিক জীবনকেও বাঁধাধরা নিয়মের অধিনস্ত করতে চেয়েছে। হাতড়ে বেড়িয়েছে সেই সমস্ত ব্যাখ্যা, যেগুলির সাহায্য নিলে সমাজে যেমন শৃঙ্খলা আনা যায়, তেমনই সমাজের অন্য সদস্যদের জন্য কিছু করার যে প্রবণতা সমাজস্থ মানুষের মধ্যে দেখা যায়, তাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা যায়। এরকম প্রচেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছে উপযোগবাদ। একদিকে আত্মসুখের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি, অন্যদিকে সামাজিক জীব হিসাবে অন্যদের জন্য কিছু করার তাগিদ— এই দুই বিপরীত ইচ্ছার প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে উপযোগবাদীরা জন্ম দিয়েছেন এমন একটি তত্ত্বের, যেখানে আপন সুখ কামনা করতে গিয়ে মানুষ সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক মঙ্গল বিধান করে।

কিন্তু নৈতিকতাকে যুক্তিবুদ্ধির ঘেরাটোপে বন্দি করার এই মানবীয় চেষ্টা যুক্তিবাদী মনস্ক বিশ্ববাসীর কাছে যতই বাহবা পাক, এই পর্যন্ত ওই চেষ্টা সফল হয়েছে বলে

অরবিন্দ মনে করেন না। আর ভবিষ্যতেও যে এই সাফল্য আসবে সে ব্যাপারে তিনি খুব একটা আশাবাদী নন। তাঁর অভিমত, আপাত দৃষ্টিতে মানুষ যাকে বুদ্ধিবৃত্তির সাফল্য ভাবছে, তা আসলে 'বুদ্ধিবৃত্তির ভান মাত্র'। তাঁর ভাষায়, "mere pretences of the intellect।"[৭৫] তাঁর মতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি শব্দ ও ভাবধারার মাধ্যমে যেসব সুন্দর সুন্দর কাঠামো রচনা করেছে, সেগুলি আসলে শূন্যগর্ভ। এগুলিকে 'তর্ক শাস্ত্রের বিশুদ্ধ উপপাদ্যের জোড়াতালি দেওয়া সমন্বয়' (mere conventions of logic and vamped-up syntheses)[৭৬] হিসাবে দেখেছেন তিনি।

শ্রীঅরবিন্দ একদিকে যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শনের তীব্র বিরোধী ছিলেন, তেমনি নৈতিক তত্ত্ব হিসাবে বেন্থামীয় উপযোগবাদেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। ঊনবিংশ শতককে যুক্তি, বিজ্ঞান ও উপযোগের শতাব্দী বলে মহিমান্বিত করেছেন তিনি। এই শতকে যে সকল সদর্থক এবং সুসংবদ্ধ চিন্তা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তার কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন অরবিন্দ। কিন্তু নীতিতত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ যতই অসাধ্য সাধন করুক না কেন, তা যে ত্রুটিমুক্ত ছিল না, সে ব্যাপারে তিনি আমাদের স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ এক পরমাণুবাদী ও সুখবাদী মনস্তত্ত্বের উপর নির্ভর। যে সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনে বেন্থাম বিশ্বাসী ছিলেন, তা ছিল ইউরোপীয় ব্যক্তিবাদ এবং প্রথাগত অভিজ্ঞতাবাদী নীতিদর্শনের এক সমন্বয়। এই উপযোগবাদ যে অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল, তা ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো এবং ফিজিওক্র্যাটদের কাছ থেকে পাওয়া। মুক্ত বাণিজ্য, স্বল্প কর ব্যবস্থা, মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির দুর্নীতির বিলোপ

[৭৫] The Human Cycle, *The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-25)*, p. 148.

[৭৬] Ibid.

সাধন, ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির এই সুপারিশগুলির সমর্থক ছিলেন বেন্থাম। আসলে বেন্থামীয় উপযোগবাদ এক পরিশোধিত পরার্থবাদী ধারণার উপর গড়ে উঠেছিল, যা বিশুদ্ধ পরার্থবোধের আদর্শকে গ্রহণ করেনি। এই ছদ্মবেশী পরার্থবাদ ভারতীয় হিতবাদের থেকে একেবারেই আলাদা। একে শ্রীঅরবিন্দ অভিহিত করেছেন এক বিপদজনক ছলনাকারী সুবিধাবাদ (Dangerous pretender expediency)[৭৭] হিসাবে। উপযোগবাদের বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছেন, একে একে সেগুলির উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক।

আদর্শ হিসাবে উপযোগবাদের ত্রুটি হল এটি ভীষণ ভাবে আপেক্ষিকতাবাদী (Highly relativistic)। ব্যক্তির পরিবর্তনের সাথে সাথে এর আদর্শ ও প্রয়োগ বদলে যায়। এই আপত্তির কথা স্বামী বিবেকানন্দও উত্থাপন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন এক সমাজের কাছে যা ভালো বা উপযোগী, তা অন্য সমাজে ভালো বা উপযোগী নাও হতে পারে। দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা লক্ষ্য করি এমন বহু জিনিস আর উপযোগী বলে গণ্য হয় না, যেগুলি এক সময় মানুষের কাছে অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে হত। যে পরিচ্ছদ পরিধান অপরিহার্য বলে গণ্য হত, সেই সকল পোশাক আজকের দিনে কারোর কাছে উপযোগী বলে মনে হয় না। চাষবাসের ক্ষেত্রে জমি কর্ষণের যে পরম্পরা ছিল, এই যান্ত্রিক যুগে তা প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। একই সময়ে দাঁড়িয়ে এক সমাজে যে আচরণধারা বিধি বলে গণ্য হচ্ছে, অন্য সমাজ ব্যবস্থায় তাই নিষিদ্ধ। প্রকৃত নীতিতত্ত্বের কোনো কানুন (Canon) এই উপযোগবাদ দিতে পারে না। কারণ উপযোগিতার ধারণাটি আপেক্ষিক, কিন্তু নৈতিকতা অনপেক্ষ। দেশ ভেদে, সমাজ ভেদে, কাল ভেদে তার কোনো ব্রত্যয় হয় না। অরবিন্দের মতে নৈতিক ক্রিয়ার আসল মানদণ্ড নিহিত মঙ্গলের উপলব্ধির মধ্যে।

[৭৭] Ibid, p.150.

এই উপলব্ধি কোনো যৌক্তিক চর্চা থেকে সে পায় না, বরং সহজাত প্রবণতা থেকেই এই ভালোত্ব বোধ পেয়ে থাকে সে। ভালোত্বের, মঙ্গলময়ত্বের এই ব্যক্তিগত উপলব্ধি তার স্বভাব ও স্বধর্ম নির্ধারণ করে দেয়।[৭৮] প্লেটো যেমন সব ধারণার উপরে মঙ্গলের ধারণাকে স্থান দিয়েছিলেন, জাগতিক সমস্তকিছুই সেই পরম মঙ্গলের ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তেমনি শ্রীঅরবিন্দ মঙ্গলের ধারণাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন যার সাথে সংগতি রক্ষা করে ব্যক্তি বিশেষের জীবন, কর্ম মঙ্গলময় বলে গণ্য হয়। কিন্তু আদর্শের দ্বারা জীবনের ভালোত্ব নির্ধারণ না করে, উপযোগবাদীরা ব্যবহারিক জীবনের ভালোত্ব দিয়ে পরম ভালোত্ব বা আদর্শকে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। ব্যবহারিক যুক্তির দোহাই দিয়ে যে আদর্শে উপনীত হওয়া যায় না, সেটি বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের উপলব্ধিতে আসেনি সসীম সংখ্যার যোগফল, তা যত অন্তহীন ভাবে প্রসারিত হোক, কখনই অসীমকে স্পর্শ করতে পারে না। যৌক্তিক বিচার দিয়ে, সর্বাধিক জনের সুখের সামাজিক দাবি দিয়ে ব্যক্তির নৈতিক আদর্শকে নির্ধারণ করতে গেছেন তারা। আর এভাবে গাড়ির আগে ঘোড়াকে না জুড়ে, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়েছেন বলা চলে।

এখানে বলা দরকার যে, নীতিবিদ্যা কে নিছক একপ্রকার সমাজবিজ্ঞান হিসাবে দেখেননি অরবিন্দ, বরং এ হল তাঁর কাছে আত্মানুপলব্ধির এক সাধারণ পথ— দিব্য সত্তাকে উপলব্ধি করার এক রাস্তা। এক পরম শুভকে লাভ করার লক্ষ্যে শুভত্বের উপলব্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবন পথে অগ্রসর হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য। মানুষ ঠিক কোন নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হবে, তা নির্দেশ করতে গিয়ে অরবিন্দ মন্তব্য

[৭৮] *The Political Philosophy of Sri Aurobindo*, Vishwanath Prasad Varma, p. 322.

করেছেন, "Stick to his principle of good, his instinct for good, his vision of good, his intention of good and to govern by that his conduct."[৭৯]

এক হিসাবে ভারতীয় নীতিদর্শন উদ্দেশ্যবাদী দর্শন। ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জ্ঞানতত্ত্ব ও নানা বিষয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও, আস্তিক্যবাদী কী নাস্তিক্যবাদী, ঈশ্বরবাদী কী নিরীশ্বরবাদী— প্রায় সকল ভারতীয় প্রস্থানেই মোক্ষই হল লক্ষ্য। এককথায় ভারতীয় সব শাস্ত্রগুলি মোক্ষশাস্ত্র। এর অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি লোকহিতের কথা বলে না। ভারতীয় আদর্শ অনেকার্থেই হিতবাদের বা লোকহিতের আদর্শ। কিন্তু সেখানে লোকহিত উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়নি বরং তার স্বীকৃতি উপায় হিসাবে।

এমতের বিরোধিতা করে কেউ বলতে পারেন গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ তা কর্তব্যের জন্য কর্তব্যের আদর্শ। সেখানে উদ্দ্যেশাভিমুখতা কোথায়? 'কর্মণ্যে বাধিকারস্তু মা ফলেষু কদাচন'[৮০]— অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে নয়। এই আদর্শ যে গ্রন্থ প্রচার করে তা তো কর্তব্যের জন্যই কর্তব্যের দাবি রাখে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যতই নিছক কর্তব্যবাদী বলে মনে হোক, গীতোক্ত কর্মযোগের আদর্শ মোক্ষের রজ্জুতেই বাঁধা। গীতা যখন যজ্ঞার্থ কর্মের উপদেশ করে, বা অনাসক্ত কর্মের কথা বলে, তখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, ঈশ্বরের কর্ম, ঈশ্বরের দ্বারা কৃত হচ্ছে এমন একটি ভাব প্রকাশ পায়। এর মধ্যে স্থূল সুখের কামনা থাকে না ঠিকই, কিন্তু একটি সূক্ষ্ম উচ্চতর অনুভূতিই যে ভক্তের নৈতিক কর্মের প্রণোদন হিসাবে কাজ করে, তা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং,

---

[৭৯] The Human Cycle, *The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-25)*, Sri Aurobindo p. 150.

[৮০] শ্রীমদ্ভগবদগীতা- ২/৪৭।

গীতা যখন লোকসংগ্রহের কথা বলে, তখন তা নৈতিক কর্মের জন্যই নৈতিক কর্মকে নির্দেশ করে না, বরং মোক্ষ লাভের অভিলাষে নৈতিক কর্ম করার কথা বলে।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে উপযোগবাদী নীতির মধ্যে ভাবাত্মক ও দার্শনিক উপাদান কিছু নেই। এই মতবাদ খুবই সীমিত, নিশ্চিত এবং সহজলভ্য। এটি আমাদের কোনো সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। তাঁর মতে, যা সত্য তা হল নিশ্চিত এবং পর্বতের ন্যায় চিরস্থায়ী ও শক্তির অমোঘ অস্ত্র। কিন্তু যা সত্য নয় তা ক্ষণিকের জন্য শক্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারে মাত্র, পরিশেষে তা বিফল হয় এবং এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এই বিশ্বচরাচর সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। উপযোগবাদ অসত্য হওয়ায় তা থেকে সাময়িক সান্ত্বনা হয়তো লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো সাধারণ বা সার্বিক আদর্শের সন্ধান এই তত্ত্ব দিতে পারে না। এই মতবাদ এক মহৎ সত্যের অন্বেষণের অজ্ঞানময়, অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপূর্ণ প্রয়াস মাত্র। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "... blundering effort to grope for a great truth।"[৮১]

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে উপযোগবাদ আসলে গণিতের মানদণ্ডে নৈতিকতাকে নির্ধারণের এক ব্যবস্থা। তিনি একে বলেছেন, 'a system of morality by arithmetic'।[৮২] উপযোগবাদীরা যে 'সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ'-এর আদর্শকে অনুসরণের করেছেন, তা শ্রীঅরবিন্দের কাছে যতখানি গাণিতিক বলে মনে হয়েছে, ততখানি নৈতিক বলে মনে হয়নি। তাঁর জিজ্ঞাসা ভালোত্বের সর্বাধিক্যকে অঙ্কের নিয়মে গননা করা যায় কি? এই মতবাদ ওজন ও মাপের এমনসব মানদণ্ডের কথা আমাদের বলে, যা বাস্তবে নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনো কাজ করার পূর্বে সেই কাজ থেকে

---

[৮১] Isha Upanishad, *The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-17)*, Sri Aurobindo, p. 150.

[৮২] Ibid, p. 148.

কী পরিমাণে সুখ বা দুঃখ আসবে এবং তার দ্বারা কত লোক ভিন্ন ভিন্ন ফল পাবে— এর গাণিতিক হিসাব করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন না। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দের পরিহাস— উপযোগবাদী নীতির এই গাণিতিক হিসাব নিকাশের জন্য অন্য এক গ্রহের দরকার এবং মানুষী স্তরে এইরূপ সুযোগ্য হিসাব রক্ষকেরও জন্মগ্রহণ প্রয়োজন।[৮৩] কোনো পরিমাপের মাপকাঠি দিয়ে সুখ-দুঃখ বা ভালো-মন্দের পরিমাণ স্থির করা যায় না। তাছাড়া কোনো পরিমাপ দ্বারা নিয়ত পরিবর্তনশীল মানুষের অনুভব ও অমূর্ত ভাবাবেগকে ধরা যায় না। ভালোত্বের উপলব্ধি এক অমূর্ত উপলব্ধি। পরিবর্তনশীল মানুষের ওই অমূর্ত ভাবাবেগকে কোনো মানদণ্ডের নিরিখে পরিমাপ করা অসম্ভব।

অরবিন্দ মনে করেন যে সময়কালে উপযোগবাদের উদ্ভব হয়েছিল সেই সময়ের বিচারে, তা হয়তো সমাজের কিছুটা হিত সাধন করেছিল। একটা সময়ে একে অত্যন্ত কার্যকরী ও সুনিশ্চিত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সাময়িকভাবে উপকারী হলেও যেহেতু মানুষের প্রকৃতি থেকে তা নিঃসৃত হয়নি, তাই সত্যতার আধারে এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং এই মতবাদ সত্য না হওয়ায়, স্থায়ী কোনো নৈতিক মতবাদ হিসাবে একে স্বীকার করা যায় না। একে তিনি দেখেছেন আলোকশূন্য এবং প্রেরণাশক্তিহীন এক নিরস, শুষ্ক ও নিষ্প্রাণ মতবাদ হিসাবে। এ-প্রসঙ্গে শ্রী অরবিন্দের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য— এই মতবাদের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান তা পরসেবার এক নকল রূপ বা ব্যঙ্গচিত্র।[৮৪]

---

[৮৩] "This system of moral accounts needs a different planet for its development; a qualified accountant has yet to be born on the human plane." – Ibid, p. 149.

[৮৪] Ibid.

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে অরবিন্দের গুরুত্বপূর্ণ একটি আপত্তি হল যে, এই মতবাদ আত্মত্যাগের সমর্থনে কোনো দার্শনিক যুক্তি বা তার দিকে সাগ্রহ প্রেরণা দিতে একেবারেই অক্ষম। উপযোগবাদ আসলে সুখবাদেরই একটি প্রকার মাত্র, যার বক্তব্য হল, আমরা যখন অপরের মঙ্গল করি, তখন আসলে আমরা নিজেদের এমন এক সুখ দিই, যা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমিত পরিতৃপ্তির সুখ অপেক্ষা অনেকবেশি দুষ্প্রাপ্য ও গভীর। অরবিন্দের দৃষ্টিতে উপযোগবাদের মধ্যে প্রেরণাশক্তি খুবই কম এবং সংকট কালে তা আমাদের কোনো কাজেই লাগে না। তাঁর মতে উপযোগবাদ বড়োজোর দাক্ষিণ্যের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু কোনো আত্মত্যাগ কখনও এই নীতি থেকে আসে না।[৮৫] সেবা ও দয়ার মধ্যে বিবেকানন্দ যে পার্থক্য করেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দরিদ্রের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান তিনি তার অনুগামীদের কাছে রেখেছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন দয়ার মনোভাব নিয়ে ওই সকল দুঃস্থ মানুষদের পাশে না দাঁড়ায়; বরং সেবার মনোভাব নিয়ে যেন তারা অগ্রসর হন। সাহায্যের একটা সুযোগ— চিত্তশুদ্ধির একটা উপায় তারা করে দিয়েছেন বলে যেন সকৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের প্রতি আচরণ করেন। দাক্ষিণ্যের মনোভাব নয়, আত্মত্যাগের মনোভাবই যে পরহিতের আসল প্রেরণা, স্বামীজীর মতো শ্রীঅরবিন্দও সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

এই সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা শুধুমাত্র প্রেম ও স্বার্থশূন্যতা থেকে অপরের জন্য কাজ করেন। শুধুমাত্র অপরকে সাহায্য করার আনন্দে, অপরের জন্য কষ্টভোগ করার আনন্দে অশ্রুক্লিষ্ট মুখে ও যন্ত্রণামলিন চোখে অপরের আনন্দ ফিরে

[৮৫] Ibid, p. 150.

আসতে দেখার আনন্দে তারা এক পরমানন্দ অনুভব করেন। পরের স্বার্থে আত্মত্যাগ করা বা অপরের আনন্দে পরমানন্দ লাভ করার কোনো ব্যাখ্যা উপযোগবাদ দিতে পারে না। অন্যের হিত করে আমরা যে পরমানন্দ লাভ করি, অরবিন্দের মতে তা আসে আমাদের অন্তঃস্থ ভগবানের উৎসবন হতে। তাই সুখবাদী তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ অসার।

এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ স্মরণ করিয়ে দেন যে, সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভ এগুলোর কোনো স্থায়ী ও নির্দিষ্ট সত্তা নেই। এগুলো আপেক্ষিক এবং আত্মার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে আমরা যখন যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি, তার উপর এদের স্বরূপ নির্ভর করে। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মধ্যে শারীরিক ও ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তি লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিমের মতই অরবিন্দ বিশ্বাস করেন যে, মানুষ একপ্রকার যৌগিক সত্তা আর যে যৌগিক ফলকে আমরা মানুষ বলি, তা আসলে শারীরিক (corporeal), প্রাণিক (vital), মানসিক (mental), বুদ্ধি বিষয়ক (intellectual), এবং স্বরূপগত (essential) এই উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিত। যে উপাদানের মধ্যে পরমাত্মা অবস্থান করেন, তা এই বিভিন্ন উপাদানের কোনো একটিতে বর্তমান থাকে না, বরং এই উপাদানগুলির অতীত ও অতিস্থিত। সুতরাং মানবাত্মার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিই, তার উপর শুভ-অশুভের ধারণা নির্ভর করে। আমরা যদি আত্মাকে অতি নিম্নে অর্থাৎ শারীরিক স্তরে স্থাপন করি, তাহলে আমাদের কাছে 'শুভ' হবে পৃথিবীর এক হীন বিষয়, মলিন এবং অশুভের সাথে এর তেমন কোনো পার্থক্য থাকবে না। আবার আত্মাকে আমরা যদি তার সত্যকার স্থানে স্থাপন করি, তাহলে শুভ বা মঙ্গলের ধারণা হবে অন্তরীক্ষের মতো উচ্চ, বিশাল এবং বিশুদ্ধ। আমাদের সকল সুখ-দুঃখ, শুভ-অশুভের উৎপত্তি, স্থিতি ও অন্ত হল আত্মা। এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রেম এমনকি পরোপকার প্রবৃত্তিও

আত্মার দ্বারা সীমিত। তিনি পরোপকার বলতে অপরের কাছে নিজ আত্মার বলিদানকে বোঝাননি। তাঁর মতে পরোপকার হল প্রকৃত আত্মার নিকট মিথ্যা আত্মার বলিদান। এই বক্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে আমরা বলতে পারি যে, বড়ো আমির সমুদ্রে ছোটো আমির পর্যাবসন। এই প্রসঙ্গে কবিগুরুর কবিতার একটি পংক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় –

আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি

অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে –

সাগরে পড়িব অবশেষে।

জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে

রচিত হতেছে পলে পলে

অনন্ত জীবন মহাদেশ,

কে জানে হবে কি তাহা শেষ।[৮৬]

এখানে সাগর বলতে আসলে মহা আমিকে বোঝানো হয়েছে। আর সেই মহা আমির সাগরে ক্ষুদ্র আমির বিসর্জন, শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃত আত্মার কাছে মিথ্যা আত্মার বলিদানের সাথে তুলনীয়। যারা যোগী বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি তাঁরা সরাসরি উপলব্ধির মাধ্যমে এই সত্য জানতে পারেন। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা এই প্রকৃত আত্মার স্বাদ উপলব্ধি করি অন্য মানুষের মধ্যে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা যখন অন্যের মধ্যে নিজেদের দেখি বা অন্য ব্যক্তির সাথে গভীর প্রেমে আবদ্ধ হই, তখন আসলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, আত্মভিন্ন অন্য ব্যক্তির প্রতি সেই প্রেম নিবেদিত হয়। বাস্তবে কিন্তু

[৮৬] অনন্ত জীবন, *প্রভাত সংগীত*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২৪।

তা নয়। সে কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ— "প্রকৃত প্রেম অপরের প্রেম নয়, ইহা আমাদের আত্মার প্রেম।" এই একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পায় যাজ্ঞবল্ক্যের বয়ানে— "ন বা অরে জায়ায়ে কামায় জায়া প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।"[৮৭] অর্থাৎ তাঁর মতে, স্ত্রী প্রিয় বলে আমরা কামনা করি না, আত্মার জন্যই আমরা স্ত্রীকে কামনা করি।

বেদান্তের মূল ভাবকে মেনে নিয়ে অরবিন্দ মানুষের মধ্যে নানা কোষের কথা বলেছেন। জীবাত্মা নানারকম কোষের মধ্যে থাকে— অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। তিনি বেদান্তের এই কোষ বিভাগকে স্বীকার করে নিয়ে দেখিয়েছেন যে, আসলে এক কোষ থেকে যা সুখকর অন্য কোষের দিক থেকে দেখলে তা সুখকর নয়। অন্নময় কোষের দিক থেকে যা সুখের প্রাণময় কোষের থেকে সুখের নয়। যেমন অন্নময় কোষের দিক থেকে খাদ্য, যৌনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি সুখকর। কিন্তু প্রাণময় কোষের দিক থেকে প্রাণিকতা বা গতিই হল সুখের। আবার মনোময় কোষের দিক থেকে বিচার করলে খাদ্য, যৌনতা বা গতি কোনোটিই সুখকর নয়, সুখের বিষয় অন্যকিছু। কোষের উত্তরণের সাথে সাথে সুখবোধের ধারণাও পরিবর্তিত হতে থাকে। সুখ ও দুঃখের ধারণাগুলি খুবই আপেক্ষিক তাই এদের মানদণ্ডে নৈতিকতার নির্ধারণ কোনো চিরকালীন নির্ধারণ হতে পারে না। যেকথা বিবেকানন্দও স্বীকার করেছেন। এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যা সুখের অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা সুখের নাও হতে পারে। সুতরাং সুখ বা দুঃখের কোনো চিরন্তন সত্তা নেই। একটা স্তরে গিয়ে যখন আমরা কোষের আবরণকে উন্মোচন করি, তখন সুখ বা দুঃখের কোনো অনুভূতিই আর আমাদের থাকে না।

---

[৮৭] বৃহদারণ্যক উপনিষদ- ২/৪/৫।

এই প্রসঙ্গে অরবিন্দ বলেছেন, অন্নময় কোষকে আত্মা বলে ভুল করলে শুধুমাত্র দৈহিক তৃপ্তির কারণে স্ত্রী আমাদের কাছে সুখকর হয়। প্রাণিক আবেগাত্মক কোষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অত্মাকে দেখলে সৌন্দর্যগত তৃপ্তির জন্য স্ত্রী আমাদের কাছে সুখদায়ক হয়। আবার যদি বুদ্ধিবিষয়ক কোষকে আত্মা বলে ভুল করি তাহলে বিভিন্ন মানসিক সৎগুণ ও বৌদ্ধিক পরিতৃপ্তির বিষয় রূপে স্ত্রী আমাদের কাছে প্রিয় হয়। আনন্দময় কোষের মধ্যে আত্মাকে দেখলে প্রকৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য কোনো বিষয় আমাদের কাছে সুখকর হয়। যদি কোষ বা আবরণহীন অবস্থায় প্রকৃত আত্মাকে উপলব্ধি করি, তা হলে বাহ্য বা মানসিক কোনো বিষয়ই আর আমাদের সুখ বা দুঃখবোধ উৎপন্ন করবে না।

সুতরাং আমরা কোষের সাথে আত্মাকে অভিন্ন মনে করি বলেই কোনো একটি কোষের দিক থেকে যা সুখকর, তাকেই প্রকৃত আত্মার সুখ বলে মনে করি। আমরা যতই প্রকৃত নিরাবরণ আত্মার দিকে উত্তরণ করি, সুখও ততই শুদ্ধ হয় এবং শুভত্বের ধারণা তত উন্নত হয়। কোষহীন আবস্থায় প্রকৃত আত্মা সুখ দুঃখের অতীত, কারণ তখন শুভ অশুভের প্রতি আকর্ষণের কোনো প্রয়োজন থাকে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সুখের বিভিন্ন স্তরভেদ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে স্থূল শারীরিক সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হল ভাবগত সুখ। ভাবগত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হল সৌন্দর্যগত সুখ। আবার সৌন্দর্যগত সুখ অপেক্ষা মহত্তর হল বুদ্ধিগত সুখ। বুদ্ধিগত সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হল নৈতিক সুখ এবং নৈতিক সুখ অপেক্ষা মহত্তর হল আধ্যাত্মিক সুখ। নীতিবিদ্যার মূল তত্ত্ব এর মধ্যেই নিহিত।

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি আপত্তি হল, একজন মানুষের পক্ষে সকল মানুষের হিত সাধন করা সম্ভব নয়। তাই জনহিতকেই নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড

বললে একটি খণ্ড সত্যকে স্বীকার করা হয়। মানুষ তার সীমিত জীবনের পরিসরের মধ্যে যতজন সম্ভব ততজন মানুষের হিত বা কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক হিত করা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সীমিত জীবন ও সীমিত দৈহিক সক্ষমতার বলে আমরা হয়তো কিছু মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারি বা যতজন সম্ভব ততজন মানুষের হিত করতে পারি। কিন্তু এথেকে এই দাবি করা যায় না যে, সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক হিত করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যেমন কোনো একটি বিশেষ আপেলের পতন দেখে নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু শুধু আপেলের পতন দিয়েই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না, এটি একটি সার্বিক সাধারণ নিয়ম যার ফলশ্রুতি হল, যে কোনো বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী পতন। সুতরাং খণ্ড পতনের দ্বারা সমগ্র নিয়মের ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা ভ্রান্তির স্বীকার হই।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে, উপযোগবাদের মতো নৈতিক মতবাদগুলি এক কার্যোপযোগী ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। এই সকল নৈতিক মতবাদগুলির মূল কাজ হল সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অস্থায়ী লক্ষ্যের জন্য বিভিন্ন শক্তির সমীকরণ ও সক্রিয় শক্তিগুলির পরিমিত ব্যয়। 'উপযোগ'-কেই যদি নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে অধিক সংখ্যকের জন্য বা সমাজের জন্য আমরা কেন ব্যক্তিগত উপযোগিতাকে বিসর্জন দেব, তার কোনো সদুত্তর উপযোগবাদীরা দিতে পারেন না। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ব্যক্তি আমির কাছে উপযোগিতা হল আমার নিজের আরাম ও নিরাপত্তার সাথে সংগতি রেখে এই জীবন থেকে যত বেশি ইন্দ্রিয়গত, ভাবগত এবং বুদ্ধিগত সুখ লাভ করা যায় তা নিশ্চিত করা। এই উপযোগ হল প্রাণিক, ইন্দ্রিয়গত ও ভাবনাত্মক 'আমি'-র জন্য। কিন্তু উপযোগবাদীরা যখন কোনো উচ্চ

বা বৃহত্তর উপযোগের জন্য বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সুখ বা উপযোগিতাকে ত্যাগের কথা বলেন, তখন তার সমর্থনে কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আমরা পাই না। আমারা লক্ষ্য করি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কিংবা দক্ষ রক্ষী ব্যবস্থার জন্য আমাদের আত্মসুখ কিছুটা হলেও ত্যাগ করতে হয়। তবে এক্ষেত্রেও এই আত্মসুখ বিসর্জন আসলে আমাদের নিরাপত্তা ও আরামকেই নিশ্চিত করে। সমাজ আমাদের নিরাপত্তা দেয় তাই আত্ম নিরাপত্তার তাগিদেই সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষার একটা দায় আমাদের বর্তায়। এই ব্যবস্থা হল কার্যোপযোগী, তাই এটি আমাদের কাছে উপযোগমূলক এবং যুক্তিসম্মত। এর বাইরে আমাদের উপর সমাজের কোনো দাবি থাকতে পারে না, কারণ সমাজ আমাদের জন্যই অস্তিত্বশীল, আমরা সমাজের জন্য নই। সেই পর্যন্তই আমি সমাজকে চাইব, যতদূর সমাজের অস্তিত্ব না থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষ একা দুর্বল এবং একাকী সে সমাজে সব সুখ ভোগ করতে সক্ষম নয়। সম্মিলিতভাবে বা সমাজবদ্ধ হয়েই মানুষের পক্ষে সুখ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। তাই একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্তই আমরা সমাজ তথা অপরের কল্যাণ কামনা করি। যতদূর পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ হয়, ততদূর পর্যন্তই আমরা সমাজের স্বার্থে কাজ করি। সুতরাং সমাজ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কেবলমাত্র ব্যক্তিসুখ লাভ বা ইচ্ছা পূরণের এক উপায় মাত্র। এই পরিস্থিতিতে উপযোগবাদীরা যখন সমাজ বা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর স্বার্থে আমার ব্যক্তিগত ভালোলাগা, গার্হস্থ্যসুখ বা প্রাণ এইসব বিসর্জনের কথা বলেন, তখন সেই সমাজের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না আমাদের কাছে। শ্রীঅরবিন্দ এরূপ সমাজকে তুলনা করেছেন এমন এক অসৎ আমানতকারী হিসাবে। যে আমার নৈতিক ব্যাংক থেকে তার গচ্ছিত টাকার অতিরিক্ত নিতে চায়। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে

আমরা কেন সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বার্থে আত্মসুখ বিসর্জন দেব, উপযোগবাদ তার কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে একটি অন্যতম আপত্তি হল যে, এই মতবাদ আমাদের কোমল মানবিক ভাবকে বর্জন করে আর শক্তি ও ভয় ছাড়া এই মতবাদের মধ্যে এমন কোনো বিধিনিষেধ নেই, যা আমাদের সমাজবিরুদ্ধ কোনো আচরণ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। এমন আপত্তির উত্তরে উপযোগবাদীরা হয়তো বলতে পারেন, স্বার্থপর ও সমাজবিরুদ্ধ কার্যকলাপে আমরা যে আনন্দ পাই, তার থেকেও গভীর, সূক্ষ্ম ও সত্যিকারের আনন্দ আছে সৎ নৈতিক আচরণ বা পরোপকারের মধ্যে। কিন্তু উপযোগবাদীদের এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো দার্শনিক যুক্তি নেই, এমনকি বাস্তব অভিজ্ঞতাতেও এর সমর্থনে কোনো প্রমাণ পায় না। বাস্তবে একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে তার গভীরতম সুখ হল প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত। সুতরাং কোনো গভীর ও প্রকৃত আনন্দের জন্য আমরা কিছু করব, এই কথা উপযোগবাদের ক্ষেত্রে একেবারেই খাটে না। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ক্ষেত্রে একথা কার্যকর হতে গেলে সেই ব্যক্তিকে আর ইন্দ্রিয়পর থাকলে চলবে না, তাকে আধ্যাত্মিক হতে হবে। কিন্তু উপযোগবাদী দর্শন আমাদের আধ্যাত্মিকতার সন্ধান দিতে একেবারেই অক্ষম। তাঁর মতে, উপযোগবাদীদের উচ্চতর ও প্রকৃত আনন্দের ধারণা আসলে খ্রিস্টধর্মের সিন্দুক থেকে ধার করা, আর এর উপর নির্ভর করেই ইউরোপীয় সভ্যতা অনিশ্চিতভাবে জীবিত রয়েছে। খ্রিস্ট ধর্মের নৈতিক মুদ্রা যেদিন নিঃশেষিত হবে, সেদিন সমাজের চরম অবক্ষয় নেমে আসবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সতর্কবাণী হল—

> যেদিন এই মুদ্রা নিঃশেষ হবে সেদিনের কথা ভাবলে শরীর কাঁপে - আর ইতিমধ্যেই আমরা ইওরোপীয় মানসে বর্ধিষ্ণু নৈতিক কদর্যতা, কর্কশতা এবং ক্রুরতার কিছু কিছু নিদর্শন দেখি

> আর যদি ইহা বৃদ্ধি পায়, যদি রাজনীতিতে ও বাণিজ্যে পাশব শক্তি ও সংকোচহীন ক্ষমতার প্রকাশ্য পূজা সমাজের গভীরতর হৃদয় কলুষিত করে - আর পরিশেষে তা করবেই - তাহলে তার ফলে সব প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত সংবেগের এমন এক উন্মত্ত উৎসব শুরু হবে যা রোমক সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা দুর্দিনের পর আর ঘটে নি।[৮৮]

একজন ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যদি সামর্থ্য থাকে তার সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার, তা হলে কেন সে আত্মসুখ লাভ থেকে নিবৃত্ত হবে? আমরা যদি নিরাপদ কোনো প্রতারণার দ্বারা, জুয়া খেলে, পূর্ব অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা অথবা আমেরিকার ধনী ব্যক্তিদের নির্দয় সব উপায়ের দ্বারা দ্রুত প্রচুর ধন সম্পত্তি উপার্জন করে আত্মসুখ লাভের পথ প্রশস্ত করতে সক্ষম হই, তাহলে তা থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করব কেন? কারণ উপযোগবাদ অনুযায়ী উপযোগিতা বা সুখ লাভ করাই হল নৈতিকতার একমাত্র মানদণ্ড। এক্ষেত্রে হয়তো কেউ আপত্তি করতে পারেন যে, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করা সমাজবিরুদ্ধ কাজ। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে, উপযোগভাবপ্রবণ এই যুগে ইন্দ্রিয়সর্বস্ব মানুষের কাছে নৈতিকতা হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র সামাজিক বা আইনসম্মত শাস্তির ভয়। কিন্তু বলিষ্ঠমনা, আত্মশ্লাঘী ব্যক্তিরা সমাজ বা আইন কোনো কিছুকেই ভয় পায় না। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে স্বর্ণমুদ্রা বর্ষণ করে সমাজের সব নিন্দাই বন্ধ করা সম্ভব। আর তাদের কার্যকলাপের ফলে যদি সামাজিক গঠন ব্যবস্থায় তেমন কোনো পরিবর্তন না আসে, তাহলে এই উপযোগভিত্তিক সমাজও তাদের নিন্দা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি অপকৃষ্টতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে জগতের হিত করার কথা বলা হয় ঠিকই, কিন্তু তা

---

[৮৮] ঈশাবাস্য উপনিষদ, *উপনিষদাবলী*, শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ৫৬০।

আত্মমুক্তির বাসনার সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, আত্মমুক্তির সাথে লোকহিতের একটি সম্বন্ধ যে আছে, তা বেদেও বলা হয়েছে। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— এই বৈদিক আদর্শ পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ তথা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবলমাত্র জগতের হিত এখানে নৈতিক কর্মের লক্ষ্য নয়। মুক্তিকে যদি এক সুখের অবস্থা হিসাবে ধরা হয়, তাহলে মুক্তির ইচ্ছা বা মুমুক্ষা সুখ লাভের ইচ্ছার সাথে এক হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে পরার্থ প্রবৃত্তির ভারতীয় আদর্শটি এক অর্থে সুখবাদে পর্যবসিত হয়— যদিও সেই স্থূল ইন্দ্রিয়সুখ হতে একান্তভাবে ভিন্ন। যদি একে চিত্তশুদ্ধির একটি উপায় হিসাবে ধরা হয়, তাহলে সেকথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মুক্তির বাসনা যদি সমস্ত ধর্মাচরণের হেতু হয়, তাহলে তা সুখ সাধনাতেই পর্যবসিত হয়। একথা উপলব্ধি করেই কেউ কেউ মোক্ষকে প্রধান পুরুষার্থ হিসাবে গন্য না করে ধর্মকেই প্রধান পুরুষার্থের মর্যাদা দিয়েছেন। একথা ঠিকই যে ধর্মকে সচারচর নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু কারও কারও মতে নিঃশ্রেয়স লাভ নয় বরং ধর্মই ধর্মের লক্ষ্য। এপ্রসঙ্গে গান্ধারীর বয়ানে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখের দাবি রাখে—

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,

মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু –

ধর্মেই ধর্মের শেষ।[৮৯]

দেশ কালের ধারণা পূর্বে না থাকলে যেমন বাহ্য অভিজ্ঞতা হতে পারে না, তেমনি নৈতিক ধারণা মানুষের মধ্যে নিহিত না থাকলে, সে সামাজিক হতে পারে না। সহজ প্রবৃত্তির

[৮৯] গান্ধারীর আবেদন, *কাহিনী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২৬।

বশে অন্য প্রাণীদের মতো একটা দল হয়তো সে গঠন করতে পারে, কিন্তু যেসব নৈতিক নিয়ম মনুষ্য সমাজকে স্বাতন্ত্র দান করে, সেই নৈতিক বোধের উদয় সহজাত নয়। অন্তত প্রাণী হিসাবে মানুষের কাছে লব্ধ নয়। সমাজ থেকেও তা মানুষের কাছে আসে না। এই চেতনার উন্মেষ হয় মানুষের অন্তরে। একে এক ধরনের জাগরণ বলা যায়। কাজেই অভিজ্ঞতা থেকে দেশ কালের ধারণাকে পাওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনই সামাজিক নিয়মের সাহায্যে নৈতিক বোধের ব্যাখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক বাধ্যতার ধ্রুপদী ব্যাখ্যা

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক বাধ্যতার ধ্রুপদী ব্যাখ্যা

৫.১ পরার্থ প্রবৃত্তি ও ভারতীয় ঐতিহ্য

এই পর্যন্ত নৈতিক বাধ্যতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা যেসব তত্ত্বের পরিচয় পেয়েছি, সেগুলি সবই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাওয়া। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে সবথেকে সন্তোষজনক বলে যেটি মনে হয় সেই ইউটিলিটিতত্ত্ব যে আসলে সন্তোষজনক নয়, সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের বিশ্লেষণ থেকেই আমরা তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, যারা ইউটিলিটিতত্ত্বে অনাস্থা জ্ঞাপন করেন, তারা বিকল্প তত্ত্ব হিসাবে কোনটিকে পেশ করতে চান? অস্বীকার মাত্রই স্বীকারের অপেক্ষা রাখে। কিছু নৈতিক তত্ত্বকে বাতিল করে দিতে গেলে কোনো না কোনো তত্ত্বকে গ্রহণও করতে হয়। প্রশ্ন হল, সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে কোন তত্ত্বটি মানুষের মধ্যে থাকা পরার্থবোধকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ধ্রুপদী ভারতীয় তত্ত্বকে মেনে নিয়ে নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরহিতের সপক্ষে ধ্রুপদী তত্ত্বগুলি যেসব যুক্তি পেশ করেছে, সেই যুক্তিগুলি বিচার করে দেখা যাক।

৫.১.১ শাস্ত্রীয় প্রবচনে পরার্থ প্রবৃত্তি

ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে যে পরম্পরা রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে নৈতিকতার পথপ্রদর্শক হিসাবে যাদের পাওয়া যায় তাদের মধ্যে রয়েছে— শাস্ত্রবচন, মুনি ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত মার্গ, বিবেকের কণ্ঠস্বর এবং মানুষের বিচারবোধ। যদিও অন্য বিচারগুলিরও যথেষ্ট মূল্য রয়েছে, তবে এ-ব্যাপারে শাস্ত্রবচনই মুখ্য। যেসব শাস্ত্র ভারতীয় ঐতিহ্যে নৈতিক আদর্শ গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করেছে, সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—

রামায়ণ ও মহাভারত, বেদ, উপনিষদ এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতা। তবে মূলত দুটি গ্রন্থের প্রভাব ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক, একটি হল বেদ এবং অন্যটি হল স্মৃতি বা গীতা। এই দুয়ের মধ্যে বেদই প্রধান। বেদকে ধর্মমূল বলা হয়েছে— বেদধর্মমূলম[১]। স্মৃতির গুরুত্ব অপরিসীম হলেও তার স্থান বেদের পরে। বশিষ্ঠসূত্রে বলা হয়েছে, 'শ্রুতি স্মৃতি বিহিতো ধর্মঃ'[২]। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল, বেদ উপনিষদকে ধর্ম বা নৈতিকতার অন্যতম প্রাথমিক উৎস হিসাবে না দেখে, তাকে সংজ্ঞায়িতই করা হয়েছে বেদ-স্মৃতি বিহিত হিসাবে। অর্থাৎ বেদ স্মৃতি এগুলি ধর্মের নানা উৎসের মধ্যে কেবলমাত্র দুটি উৎসই নয়, এগুলিই ধর্মের সংজ্ঞা। যা বেদ ও স্মৃতি বিহিত বা অনুমোদিত, তাই কর্তব্য, তাই ধর্ম। আর যা বেদানুমোদিত নয়, তাই অধর্ম। এই হিসাবে নৈতিকতা হল তাই, যা করতে বেদ ও স্মৃতি আমাদের প্রণোদিত করে। একথা শঙ্করাচার্যও বলেছেন যে, যথোচিত ও অনুচিতের মধ্যে যে তফাত, তা কেবল শাস্ত্রই আমাদের দিতে পারে। একই কথা একটু ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে গীতাতে— যা শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে, তাকে অবজ্ঞা করে বা এড়িয়ে যদি কেউ নিজের নির্বাচন অনুযায়ী কর্ম করে, তাহলে সে কখনোই সুখী হতে পারে না— এজীবনেও নয়, পর জীবনেও নয়।[৩] সুতরাং কোন কাজ করণীয় বা কর্তব্য, আর কোনটি অকর্তব্য তা একমাত্র শাস্ত্রের দ্বারাই নির্ধারিত হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ঐতিহ্যে শাস্ত্রই হল নৈতিকতার নিরতিশয় বা ধর্মের পরাকাষ্ঠা। যদিও সাধারণভাবে বেদবিহিত ও স্মৃতি নির্দেশিত কর্ম মাত্রই ধর্ম, তথাপি যেখানে উভয় গ্রন্থের নির্দেশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হবে বা বিধানের দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, সেখানে বেদকেই

---

[১] গৌতম ধর্মসূত্র – ১/১/১।

[২] বশিষ্ঠসূত্র - ১/৪/৬।

[৩] যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।। শ্রীমদ্ভগবদগীতা – ১৬/২৩।

অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন পূর্বমীমাংসায় যা বেদ নির্দেশিত, তাকেই ধর্ম বলা হয়েছে— 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ'[৪]। বেদের নির্দেশ সেখানে নিঃশর্ত এবং সর্বময়। যদিও শবর মতে শুধু চোদনা নয় অর্থপ্রাপ্তিও ধর্মের অন্যতম লক্ষণের মধ্যে পড়ে। তবে বেদানুশীলন বা বেদানুমোদিত পথে জীবন যাপনকে ধর্ম হিসাবে শুধু মীমাংসা গ্রন্থেই দেখা হয়নি, সমগ্র হিন্দু পরম্পরাতেই তাকে এভাবে দেখা হয়েছে। এভাবে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রগুলি আমাদের নৈতিক ধ্যান-ধারণা ও আচরণের নিগড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এভাবে শাস্ত্রকে নৈতিকতার সাথে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হিসাবে দেখা একটি বদ্ধ সংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে। কোথাও শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি তোলা হয়নি। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, তাদের মূল্য চূড়ান্ত ও সর্বময়, যাদের সম্বন্ধে কখনোই কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। যুক্তির কষ্টিপাথরে ওইসব বিধি নিষেধকে বিচার করার প্রস্তাব রাখা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শাস্ত্রগুলির প্রামাণ্যে বা বিশ্বাসযোগ্যতায় কোনোরূপ প্রশ্ন তোলা যাবে না। এ-ব্যাপারে মনুর সতর্কবার্তা— বেদকে শ্রুতি এবং ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতি হিসাবে মেনে নিলে তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা উচিত হবে না, কারণ ওইসব শিক্ষার মধ্যে ধর্ম বা নৈতিকতা অন্তর্নিহিত রয়েছে।[৫] বিচার বা ন্যায়ের মানদণ্ডে যে এইসব শিক্ষাকে বিচারের প্রস্তাব করে, সমাজ সেই অবিশ্বাসীকে পরিত্যাগ করবে।[৬]

---

[৪] জৈমিনি সূত্র – ১/১/২।

[৫] শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রস্তু বৈ স্মৃতিঃ।
তে সর্ব্বার্থেষ্বমীমাংস্যে তাভ্যাং ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ।। মনুসংহিতা-২/১০।

[৬] যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ।। তদেব, ২/১১।

৫.১.২ পরকল্যাণের আহ্বানে বৃহদারণ্যক উপনিষদ

প্রায় প্রতিটি উপনিষদেই সর্বহিতে কর্মের আহ্বান রয়েছে। কিন্তু অন্যের হিতে প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা দেবে, কী কারণে? তার নৈতিক প্রবর্তনা কি নিছকই অহৈতকী প্রবর্তনা? যদি প্রয়োজন বিনির্মুক্ত ভাবে কোনো মানুষই কর্মে প্রবৃত্ত হয় না, তা হলে লোকহিতে মানুষের প্রবৃত্তি হবে কেন? পর প্রবৃত্তির হেতু কি তার ব্যাখ্যা দান নীতিশাস্ত্রের কর্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নীতি শাস্ত্রে এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। কেন পিতা-পুত্র-পলত্রের, দেবে-দ্বিজে, প্রীতি ভক্তি মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে—

> ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ে কামায় জায়া প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পশবঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকা প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি।[৭]

যদিও এই উপদেশ স্ত্রী মৈত্রেয়ীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ, তথাপি এ আসলে জ্ঞান পিপাসুর প্রতি এক জ্ঞান ঋদ্ধ ঋষির উপদেশ। এর দ্বারা একথাই ব্যক্ত হয়, পতির প্রতি ভালোবাসার ফলে পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। জায়ার প্রতি প্রেমের ফলে জায়া প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয় হয়। পুত্রদের প্রতি

[৭] বৃহদারণ্যক উপনিষদ- ২/৪/৫।

স্নেহবশত পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়। বিত্তের প্রতি আসক্তিবশত বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই বিত্ত প্রিয় হয়। পশুদের প্রতি প্রীতির ফলে পশু প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পশুরা প্রিয় হয়। ব্রাহ্মণ জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ব্রাহ্মণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়। ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি প্রীতিবশত ক্ষত্রিয় প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়। লোকসমূহের প্রতি প্রীতিবশত লোকসমূহ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই লোকসমূহ প্রিয় হয়। আমরা অপরকে, এমনকি আমাদের শত্রুকেও ভালোবাসব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উপনিষদে বলা হয়েছে যে, আমরা আমাদের আত্মাকে অর্থাৎ নিজেদেরকে ভালোবাসি তাই। কারণ আমরাই সেই 'তত্ত্বমসি'[৮]।

সুতরাং আত্মপ্রীতিই পরপ্রীতির কারণ। একথা অনেকখানি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথার মতো বলে মনে হবে। তিনি আত্মপ্রীতিকে মানুষের সকল প্রবৃত্তির চালিকা শক্তি হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু ফ্রয়েডের অহংসর্বস্ববাদী মনস্তাত্ত্বিক নীতিবাদে পরহিতের কোনো স্থান নেই। আত্মপ্রীতির উপায় হিসাবে লোকহিতকে গ্রহণ করলে, একধরনের অহংসর্বস্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না কি? বিশেষত স্মৃতি ও শ্রুতি লব্ধ উপদেশের সঙ্গে আত্মপ্রীতির এই তত্ত্ব মানানসই বলে মনে হয় না।

উপনিষদ হিসাবে বৃহদারণ্যক লোকহিত বা সর্বহিতের ধারারই অনুসারী। একথা ঠিকই যে উল্লেখিত শ্লোকে আত্মপ্রীতিকেই পরপ্রীতির মূল মন্ত্র বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যে আত্মাকে সর্বাধিক প্রিয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই আত্মা সসীম ক্ষুদ্র ব্যক্তি সত্তা নয়। এই আত্মা সেই পরম সত্তা যা প্রসারিত সমগ্র জগৎ সংসারে। পিতা-মাতা, পতি-

[৮] ছান্দোগ্যোপনিষদ- ৬/৮/৭।

পত্নী, পুত্র-কন্যা থেকে শুরু করে ভূত ও ভৌতিক সকল কিছুই এই সর্বব্যাপী আত্মার মধ্যে রয়েছে। কাজেই এই আত্মপ্রীতি সর্বপ্রীতিরই নামান্তর। যিনি আপনার মধ্যে সকল এবং সকলের মধ্যে আপনাকে দেখেন, তিনি আত্মপর হলেও ব্যাবহারিক অর্থে 'স্বার্থপর' হতে পারেন না। 'স্ব' ও 'পরের' মধ্যে ব্যবধান যেখানে অবলুপ্ত, সেখানে আত্মসিদ্ধি ও সর্বসিদ্ধি সমার্থক।

৫.১.৩ ঈশোপনিষদ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের আদর্শ

হিতবাদের ভারতীয় ধারা নিরতিশয় লাভ করেছে ঈশোপনিষদে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে আত্মপ্রীতির কথা যাজ্ঞবল্ক্যের বয়ানে প্রকাশিত হয়েছে, সেই আত্মপ্রিয়তা যে সর্বভূতের প্রতি অনুরাগ, সেকথা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে ঈশোপনিষদের শ্লোকে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।।[৯]

যিনি পরব্রহ্ম হতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত সকল ভূতকে নিজ আত্মার মধ্যে দর্শন করেন এবং সকল কিছুর মধ্যে নিজের আত্মাকে দর্শন করেন, তার কাছে আত্ম-পর ভেদ বলে কিছু হয় না। এহেন আত্মজ্ঞের পক্ষে আপন হতে ভিন্ন বা আত্মাতিরিক্ত কোনো কিছুর চিন্তা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই অন্যকে ঘৃণা করা বা অন্যের থেকে নিজেকে গোপন করাও সম্ভব হয় না।

এই আত্মজ্ঞ ব্যক্তি যেহেতু সর্বভূতে আপনাকে প্রসারিত করেন, তাই শুধুমাত্র অন্য মানুষের প্রতি সদাচার বা অন্য মানুষের হিতসাধনে তৎপর হন না তিনি। ভূত-ভৌতিক

[৯] ঈশোপনিষদ- ৬।

সকল বস্তুর কল্যাণ কামনায় নিরত হন তিনি। কাজেই ঈশোপনিষদ যে আত্মজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলে, তিনি যে শুধু আপন আত্মার গণ্ডি অতিক্রম করে অপরাপর মানুষের মঙ্গল কামনায় প্রয়াসী হন এমন নয়, সেই সঙ্গে জাগতিক সকল বস্তুর হিত সাধনে তিনি তৎপর হন। শুধুমাত্র পরহিত বা লোকহিত তার ঈপ্সিত নয়, তার লক্ষ্য মানুষ থেকে মনুষ্যেতর, জীব থেকে জড় সকল ভূতের কল্যাণ।

ধর্মনীতির যে ভারতীয় ধারা তার স্বাতন্ত্র্যটি ঈশোপনিষদের এই শ্লোকের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়। এখানে স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদ্যা থেকে ভারতীয় নীতিধর্মের একটি মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। পাশ্চাত্ত্যে যাকে Ethics বা নীতিশাস্ত্র বলা হয়, তা আসলে মানুষের সাথে মানুষের কী রকম আচরণ, কর্তব্য তার একটি দিক নির্দেশ করে। মনুষ্যেতর পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ এসবের প্রতি মানুষের আচরণ কী রকম হওয়া উচিত, তা নির্ধারণে পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদদের আগ্রহ কোনো দিনই ছিল না। পিটার সিঙ্গারের *'Practical Ethics'* প্রভৃতি গ্রন্থগুলি প্রকশিত হওয়ার পর, পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদ্যায় না-মানুষী জগত সম্বন্ধে একটা আগ্রহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু মনুষ্যতরের প্রতি পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদদের এই যে আগ্রহ, তার কেন্দ্রমূলেও রয়েছে মানব স্বার্থ। মনুষ্যতরের স্বার্থ রক্ষিত না হলে যে মানব স্বার্থই বিঘ্নিত হবে, এই শঙ্কাই পরিবেশমুখী করেছে পাশ্চাত্ত্য নীতিবিদদের। পরিবেশ নীতিশাস্ত্র, জীবনকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি নীতিবিদ্যার কয়েকটি শাখাও গড়ে উঠেছে। মনুষ্যতরদের উপায় হিসাবেই দেখা হয়েছে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায়। না-মানুষী জগতের প্রতিও মানুষের একটা নৈতিক দায় যে থাকতে পারে, এই চিন্তা ভোগবাদী পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় কখনও আসেনি। অথচ মানুষের উদ্দেশ্য সাধন যে তার পরিবেশ ও প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সম্বন্ধযুক্ত এই উপলব্ধি

আদিম কাল থেকেই ছিল ভারতীয় ঋষিদের মধ্যে। তাই হিত বা কল্যাণের ক্ষেত্রকে তাঁরা শুধু মানব গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, সর্বভূতে তাকে প্রসারিত করেছেন।

উপনিষদের ঋষির স্পষ্ট ঘোষণা— 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং'[১০], এই চলমান জগতে যা কিছু আছে, সেই সকল কিছুই এক নিত্য শাশ্বত ঈশ্বরের ঐশিত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত। সর্বত্রই এক ঐশী সত্তার বাস। এই চলমান জগৎ একটি অচল সত্তারই অভিব্যক্তি মাত্র। এক অচঞ্চল গতিহীন নিত্য সত্তাকে আশ্রয় না করলে, জগতের চঞ্চল প্রবাহ সম্ভব হয় না। এই অচঞ্চল নিত্য সত্তাই সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশ্বের অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুকে ধারণ করে। এই অচঞ্চল স্থির সত্তাই ঈশ্বর। 'আমি' হিসাবে যা আমার মধ্যে বর্তমান, সেই একই আমি 'তোমার' মধ্যে, জগতের সকল কিছুর মধ্যে বর্তমান। আর এই হিসাবে জগতে যা কিছু আছে, তা এক আমিরই প্রসারিত রূপ। যে বিশ্ব জগতের সর্বত্র ঈশ্বরের বাস সেখানে পর কে? আপনই বা কে? আত্মাই বা কে? আত্মাতিরিক্তই বা কে? যাকে পর বলে গণ্য করা হয়, তা আসলে আপন সত্তারই বিস্তার। আত্মাতিরিক্ত সকল বস্তুই যদি মিথ্যা হয়, সকল কিছু যদি এক বৃহৎ আমির প্রকাশ হয়, তাহলে ক্ষুদ্র এই দেহাবচ্ছিন্ন 'আমি'-র জন্য অন্য দেহাবচ্ছিন্ন 'আমি'-কে বঞ্চিত বা প্রতারিত করা মূর্খতা নয় কি? তাই ঈশোপনিষদের উপদেশ— 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'[১১]— কারও ধনে লোভ করো না। সর্বভূতে যদি ঈশ্বর বিরাজমান হন, তাহলে জগতের কোনও বস্তুর উপরই কোনোরূপ আসক্তি বা মোহ থাকতে পারে না। সকল কিছুই যদি তুমি হও, তাহলে সকল ধনই তোমার। সেই নিজ ধনে লোভ করা হাস্যকর ব্যাপার। আপনার ধনে কে-ই বা লোভ করে। তারচেয়ে বরং লোভের পথ পরিত্যাগ করে ত্যাগের পথ গ্রহণ করো।

---

[১০] ঈশোপনিষদ-১।

[১১] তদেব।

অতএব 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'[১২] অর্থাৎ ত্যাগের পথেই ভোগ কর। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে ভোগের এই যে আদর্শ, তা আসলে অপরের হিতে আত্মবলিদানের মহান আদর্শ। সসীম আমির বিসর্জন দিয়ে, বৃহৎ আমির সমুদ্রে অবগাহন করতে যিনি পেরেছেন, একমাত্র তার পক্ষেই লোকহিতের এই মহান আদর্শে ব্রতী হওয়া সম্ভব।

৫.১.৪ শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও নিষ্কামকর্মের আদর্শ

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় মানব জাতির প্রতি কর্মের আহ্বান রাখা হয়েছে। প্রকৃতি যে কর্মের জন্যই মানব সৃষ্টি করেছে, কর্ম বিনির্মুক্ত ভাবে কেউ একটি ক্ষণও অতিবাহিত করেন না, সেকথা স্পষ্ট করা হয়েছে গীতায়।[১৩] কিন্তু গীতায় কর্মের আহ্বান থাকলেও, সেখানে যেকোনো কর্ম জীবের জন্য উপদিষ্ট হয়নি। কোন ধরনের কর্ম কর্তব্য, কোন কর্ম জীবের পক্ষে আদর্শ, তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আদর্শ কর্ম হল সেই কর্ম, যা নিষ্কাম বা অনাসক্ত। 'নিষ্কাম' কথার অর্থ কামনা শূন্য বা কামনা বিরহিত। যে কর্মের পশ্চাতে কোনোরূপ কামনা নিহিত থাকে না, সেই কর্মই নিষ্কাম। একে আসক্তিশূন্য বা নিরাসক্ত কর্মও বলা হয়। এই নিষ্কাম কর্ম সকাম কর্মের ঠিক বিপরীত। কোনো ঈপ্সিত বা কাম্যবস্তু লাভের উদ্দেশ্যে যে কর্ম সম্পাদিত হয়, তা সকাম। এককথায় যে কর্মের সঙ্গে ফলপ্রাপ্তির কামনা যুক্ত থাকে, তাই হল সকাম কর্ম। যেমন 'জ্যোতিষ্টোমযাগ'[১৪]। স্বর্গাদি ফললাভের উদ্দেশ্যে এই যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাই এটি কাম্য কর্ম। সকাম কর্মের ক্ষেত্রে হয় ঐহিক কিংবা পারত্রিক, কোনো না কোনো ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠিত কর্ম বা কাম্য কর্ম যে নিকৃষ্টতম কর্ম, গীতার কৃষ্ণবচনে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

---

[১২] তদেব।

[১৩] ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।। শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৩/৫।

[১৪] "কাম্যানি –স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি"- *বেদান্তসার*, সদানন্দযোগীন্দ্র, পৃ-৭।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।

বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।[১৫]

বক্তব্য এই কাম্য কর্ম নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নিতান্ত নিকৃষ্ট। অতএব তুমি কামনাশূন্য হয়ে সমত্ব বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করো। যারা ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্ম করে তারা অতি হীন।

নিষ্কাম কর্মের দুটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে গীতায়। প্রথমটি, যার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, তা হল ফলাভিসন্ধিশূন্যতা। আর দ্বিতয়টি হল কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা। ফলের অভিসন্ধি যে কর্মের মধ্যে থাকা উচিত নয়, তা অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

> কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। অতএব কর্ম কর। কিন্তু কর্মফলে যেন কখনও তোমার আসক্তি না হয়; কারণ কর্মফলের তৃষ্ণাই কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং কর্মফল প্রাপ্তির হেতু হইও না। আবার কর্মত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক।[১৬]

গীতোক্ত এই হিতোপদেশ একাধারে দুটি চরম দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি জড়বাদী, যেখানে ফলের আশায় কর্ম করার আহ্বান রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যারা অনুসরণ করেন, তাদের কাছে কাম্য কর্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি কোনো কোনো অধ্যাত্মবাদীর; তাদের মতে কর্ম মাত্রই ফল প্রসব করে এবং সেই ফল গ্রহণের জন্য জীবকে জন্মান্তর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। কিন্তু গীতা যেমন সকাম কর্মের অনুষ্ঠানকে অনুমোদন করে না, তেমনি কর্ম হতে সন্ন্যাসের আহ্বানও রাখে না। গীতা কর্মের মধ্যেই সন্ন্যাসের কথা বলে। এমন এক কর্মে নিয়োজিত হওয়ার কথা বলে, যে কর্মের অন্তরালে ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা নেই।

---

[১৫] শ্রীমদ্ভগবদগীতা - ২/৪৯।

[১৬] কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।। -তদেব, ২/৪৭।

কিন্তু কর্ম মাত্রই তো ফলাকাঙ্ক্ষা প্রসূত। জ্ঞান ছাড়া ইচ্ছা যেমন হয় না, তেমনি ইচ্ছা ছাড়া প্রবৃত্তি হবে কীভাবে? ইচ্ছাশূন্য উদ্দেশ্যহীন কর্ম পাগলের কর্মে পর্যবসিত হয় নাকি? অনেক পাশ্চাত্ত্য চিন্তকও মনে করেন, ফলাসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করে কারও পক্ষে কর্ম করা সম্ভব নয়। ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকলে আমরা কর্ম করব কেন? কারণ উদ্দেশ্য ভিন্ন কোনো কর্ম হয় না। উত্তরে বলা যায়, ফলাফল উদাসীনতা ও উদ্দেশ্যহীনতা এক কথা নয়। তাই নিষ্কামকর্মও উদ্দেশ্যহীন নয়। লোকসংগ্রহ বা ভগবানের সৃষ্টি রক্ষা হল এর উদ্দেশ্য। নিষ্কামকর্মী সমস্ত কর্মফল জগত হিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ঈশ্বরের চরণে বা ঈশ্বরার্থে কর্ম নিবেদনের ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হোন'— এরকম একটি অব্যক্ত ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক। যিনি কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করেন, বাহ্য ফলের পরোয়া করেন না, সেই ব্যক্তির অন্তরেও এরকম অস্ফুট ইচ্ছা থাকে যে, তার কর্ম আর কারও দ্বারা না-হোক, অন্তত ঈশ্বরের দ্বারা পুরস্কৃত হোক, অন্তত ঈশ্বর তার প্রতি প্রসন্ন হোক। কিন্তু গীতোক্ত কর্মযোগে ওই ন্যূনতম ফলের আকাঙ্ক্ষা থাকাও সমীচীন নয়। এই ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি শ্লোকে—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।[১৭]

অন্য কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে, কৃষ্ণ চরণে বা জগত হিতে সেই কর্মকে সমর্পণের উপদেশ যেমন কর্মযোগীর জন্য গীতায় উপদিষ্ট হয়েছে, তেমনই লোকহিতার্থে যে কর্ম করে তার যে কর্তৃত্বাভিমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তাও গীতায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া

[১৭] শ্রীমদ্ভগবদগীতা- ২/৪৮।

হয়েছে। পরহিতে যারা কর্ম করে থাকেন, সচারচর তাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। তিনিই যে সেই কর্ম করেছেন এবং স্বার্থে নয় পরার্থেই সেই কর্ম সম্পাদিত হয়েছে— এই বোধ অনেকের মধ্যে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু কর্তৃত্বের এই অভিমান কর্মযোগীর থাকতে পারে না। একমাত্র অহংকার দ্বারা যার চিত্ত বিমূঢ় হয়েছে, তিনি 'আমি কর্তা' এইরূপ মদগর্বে মত্ত হন।[১৮] পক্ষান্তরে নিষ্কাম কর্মের আদর্শে যিনি অবিচল, সেই কর্মযোগী নিশ্চিত জানেন— দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, আঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, নিদ্রায়, শ্বসনে, চক্ষুর উন্মেষে এবং নিমেষে আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকে। তাই একজন কর্মযোগী 'আমি অকর্তা কিছুই করি না'— এইরূপ উপলব্ধি করে তাঁর সকল কর্ম সম্পাদন করেন।[১৯]

কাজেই দেখা যাচ্ছে কর্তৃত্বের অভিমান শূন্য হয়ে কোনো ফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্ম করাই গীতার আদর্শ। এই আদর্শ অনুসরণ করে চলাই কর্মযোগীর কর্তব্য। গীতোক্ত এই কর্মযোগের সঙ্গে লোকহিতের সম্বন্ধটি একটি আকস্মিক সম্বন্ধ বলে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে গীতোক্ত পথে আপন কর্ম ঈশ্বর চরণে নিবেদন করাই নির্বাণ লাভের পক্ষে যথেষ্ট, তার দ্বারা লোকরক্ষা হোক আর না হোক। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। সর্বজীবের হিত সাধনের সঙ্গে নির্বাণ প্রাপ্তির একটি উপপাদক-উপপাদ্য সম্বন্ধ যে রয়েছে, একথা স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে গীতোক্ত দুটি শ্লোকে। সতত ত্বদগতচিত্ত হয়ে যারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং যারা অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাদের

---

[১৮] প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।। তদেব - ৩/২৭।

[১৯] নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নু স্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্।। তদেব - ৫/৮-৯।

মধ্যে তফাত কী— অর্জুন তা শ্রীকৃষ্ণের কাছে জানতে চান। পার্থের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যারা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত এবং সর্ব প্রাণীর হিতপরায়ণ হন, তারাই কৃষ্ণ লাভে সমর্থ হন।[২০]

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। চিরাচরিত ভাবে নির্বাণ সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রচলিত যে, নির্বাণ বা মুক্তির অবস্থা এক শান্ত, ধীর, স্থির, অচঞ্চল, কর্মহীন, চিত্তবৃত্তিহীন অবস্থা। কিন্তু নির্বাণের অবস্থাকে সমাধির অবস্থা হিসাবে দেখা হয়নি গীতায়। গীতার দৃষ্টিতে ব্রহ্মনির্বাণ কর্ম হতে, সংসার চৈতন্য হতে সম্পূর্ণ বিরতির অবস্থা নয়। এই অবস্থায়ও কর্ম থাকতে পারে। এ আসলে মুক্ত কর্মযোগীর অবস্থা। যেখানে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করার পরেও সর্বভূতের হিতে রত থাকেন ঋষিরা। সর্বভূতের হিতসাধন হতে কোনো বিরতি যে মুক্ত পুরুষের থাকতে পারে না, তা স্পষ্ট করতে গিয়ে গীতায় বলা হয়েছে— যারা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বভূত হিতে রত, সেই রূপ ঋষিগণ ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হন।[২১]

৫.১.৫ পরার্থ কল্যাণের মহাজন অনুসৃত পথ

সাধারণভাবে যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে শ্রুতি গ্রাহ্য বলে দাবি করেছেন শাস্ত্রকারগণ। তবে নানা শাস্ত্রের মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দেয়, তখন সেই বিরোধের মীমাংসা মহাত্মা বা ধর্মাত্মাদের পথ অনুসরণ করে সম্ভব। এসম্বন্ধে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, 'আচারচৈব সাধুনাম্' এবং 'সদাচার'।[২২] এখানে সদাচার শব্দটির দ্বারা

---

[২০] সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।। তদেব -১২/৪।

[২১] লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।। তদেব- ৫/২৫।

[২২] মনুসংহিতা - ২/১৭-১৮।

ঐতিহ্য এবং প্রথাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সদাচারের লক্ষণে মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে— "ঈশ্বর সৃষ্ট স্বর্গীয় নগরীর দুই তটিনী সরস্বতী দৃশভির মধ্যখানে বাহিত হয়েছে যে পথ তা হল ব্রহ্মবর্ত। ওই দেশে বসবাসকারী যে অমিশ্র দ্বিজ সম্প্রদায় তাদের আচরণই হল সদাচার।"[২৩] শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের যেখানে বিরোধ দেখা দেয়, সেখানে প্রথা ও ঐতিহ্যই যে পথ নির্দেশক হবে, সেকথা স্বীকার করেছেন মনু। যদিও প্রচলিত কর্মধারা ও ঐতিহ্যের তুলনায় শ্রুতি নির্দেশিত পথই অধিকতর গ্রাহ্য বলা হয়েছে অপস্তম্বধর্ম সূত্রে।[২৪] আমাদের নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে মহাত্মা বা ধর্মাত্মাদের পথনির্দেশ যে দিশারি হতে পারে, সেকথা মহাভারতেও বলা হয়েছে—

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।।[২৫]

অর্থাৎ যুক্তি যেখানে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তের পথ দেখায় না, শ্রুতির সাথে শ্রুতির যেখানে পার্থক্য দেখা দেয়, কোনো একজন ঋষির মতকে যেখানে অভ্রান্ত বলে মানা যায় না, ধর্মের তত্ত্ব যেখানে গুহাতেই নিহিত, সেখানে মহাজ্ঞানী বা মহাজনরা যে পথে চালিত হয়েছেন, সেই পথই একমাত্র অনুসরণীয়।

প্রশ্ন হল সেই মহাজন আসলে কারা, যাদের অনুসৃত পথই আমাদের পন্থা হয়ে উঠবে? এখানে মহাজন বা উত্তমজন বলতে নৈতিকভাবে উত্তম বা যেসব মহান আত্মা তাদেরই বোঝানো হয়েছে। মনু এই সমস্ত মহান আত্মাদের সাধু বলে অভিহিত

---

[২৩] তদেব।

[২৪] অপস্তম্বধর্ম সূত্রে- ১/১/৪৮।

[২৫] বনপর্ব, মহাভারত- ৩১৪/১১৯।

করেছেন। এর অর্থ এই যে, সেই সমস্ত মহাজনের পথই অনুসরণীয়, যারা মুনি ঋষিদের মতো। যে সমস্ত মহাত্মারা তাদের আবেগ ও ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন, যারা কামনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, ফলের আশায় যারা কর্ম করেন না তারাই মহাজন, তারাই সাধু।[২৬] তাদের পথই একমাত্র অনুসরণীয় পথ। ঠিক কোন ধরনের কাজ ধর্ম হবে তার পরিচয় দিতে গিয়ে জৈমিনি বলেছেন, যে সমস্ত কর্মের মূলে কোনো ঐহিক উদ্দেশ্য থাকে না, তা সত্ত্বেও মহাত্মারা যেসব কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সমস্ত কর্মই হল ধর্ম।[২৭] মহাত্মা নির্দেশিত এই সকল ধর্ম কর্ম যেহেতু ঐহিক কোনো স্বার্থের উদ্দেশ্যে নির্দেশিত হয় না, তাই এই সকল কর্মের অভিমুখ যে পরকল্যাণ তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

৫.১.৬ বিবেকের কণ্ঠস্বর ও বাধ্যতাবোধ

শাস্ত্রগ্রন্থ, মহাত্মাদের প্রদর্শিত পথ এবং মহৎ মানুষের কর্মধারা— এগুলির উপর ভারতীয় ঐতিহ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হলেও, যুক্তি-বুদ্ধি এবং বিবেকের দাবিকে কখনোই অগ্রাহ্য করা হয়নি। নৈতিকতা বিচারের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মানদণ্ড হিসাবে মনু শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচারের কথা বললেও চতুর্থ মানদণ্ড হিসাবে তিনি স্বীকার করেছেন আত্মতুষ্টিকে। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় নিম্নলিখিত দুটি শ্লোকে—

বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মন্ স্তুষ্টিরেব চ।।[২৮]

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।।[২৯]

---

[২৬] মনুসংহিতা- ২/১।
[২৭] জৈমিনি সূত্র- ১/৩/৭।
[২৮] মনুসংহিতা– ২/৬।
[২৯] তদেব– ২/১২।

প্রথম শ্লোকে 'আত্মতুষ্টি' এবং দ্বিতীয় শ্লোকে 'স্বস্য প্রিয়মাত্মনঃ' শব্দের দ্বারা নৈতিক বিষয়ে বিবেকেই যে মুখ্য নির্ণায়ক, সেকথা বোঝানো হয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়াও পুণ্যাত্মাদের আচারকে নৈতিক বিষয়ের অন্যতম পথপ্রদর্শক বলে দাবি করা হয়েছে। তবে সেখানেও নির্ণায়ক প্রমাণ হিসাবে বিবেকের কথাই বলা হয়েছে। 'মনঃ পূতং সমাচরেৎ'[৩০] ইত্যাদি প্রাচীন উপদেশেও অন্তরাত্মার নির্দেশই যে আসল নৈতিক মানদণ্ড, তা বোঝানো হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—

ঋত্বিক্‌পুরোহিতাচার্যান্ সৎকৃতানভিসৎকৃতান্।

ন ব্রাহ্মণান্ধাতয়ীত দোষানপ্রাপ্নোতি ধাতয়ন্।।[৩১]

মহৎ ব্যক্তিদের দ্বারা স্থাপিত দৃষ্টান্ত অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অনুমোদন যে নৈতিক প্রশ্নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড, তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবেকের কণ্ঠস্বর যে পথের দিশারি হয়ে ওঠে, সেকথা আরও বহু ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থগুলিতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে নৈতিক নীতি আদর্শের নির্ধারক হিসাবে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে শাস্ত্রের উপর। কিন্তু বর্তমান কালে বিশেষত অরবিন্দ ও গান্ধীর মতো সমকালীন চিন্তকদের রচনায় বিবেককে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কোন কাজ নৈতিক এবং কোন কাজ অনৈতিক, তা বিচারের প্রশ্নে এই সব সমকালীন চিন্তকরা বিবেককেই চরম মানদণ্ড হিসাবে মেনেছেন। এ-ব্যাপারে অরবিন্দ দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেছেন, "There is only one rule for the ethical man to stick to his principle of good..."।[৩২]

---

[৩০] তদেব- ৬/৪৬।

৩১ মহাভারত, শান্তিপর্ব, ১৩২/৯।

[৩২] Human Cycle, *The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-25)*, Sri Aurobindo, p.150.

নৈতিক মানুষের কাছে ভালো বা মহৎ থাকার একটাই নীতি রয়েছে, তা হল ভালোর সাক্ষাৎ উপলব্ধি, তার সহজাত মহত্ববোধ এবং সেই বোধ অনুসারে নিজ আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা। প্রায় একই কথা বলেছেন মহাত্মা গান্ধী। যদিও গান্ধী নৈতিক প্রশ্নে গীতাকেই সবার উপরে রাখেন, তবে তিনি অন্তরাত্মার নির্দেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। নৈতিকতা কোনো তুচ্ছ বিষয় নয়, তাই যে কোনো ব্যক্তির অন্তর উপলব্ধি দিয়ে এর নির্ধারণে গররাজি তিনি। অন্তরের নির্দেশে পথ চলার অধিকার কেবল সেই ব্যক্তিরই থাকতে পারে বলে তিনি মনে করেন যার নিজের আবেগ ও স্বার্থপর প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রয়েছে। যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতেই এই বিবেক, স্বার্থ ও আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে ব্যক্তিকে সঠিক সিদ্ধান্ত বাতলে দেয়।

৫.১.৭ নৈতিক বাধ্যতার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে যুক্তি বা ন্যায়ের ভূমিকা তেমন একটা স্বীকার করা হয়নি। অনৈতিকতার বিপরীতে নৈতিকতার যে ধারণা ভারতীয় ভাবধারায় আছে, তা বিকশিত হয়েছে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের গর্ভে। ফলে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে নীতিবোধে উপনীত হয়নি মানুষ। উলটে নৈতিকতার রাজ্যে যুক্তির ভূমিকাকে তুচ্ছ করে দেখানোর একটা চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় এখানে। যেমন মনু বলেছেন, যে দ্বিজ শ্রুতি ও স্মৃতির উপদেশকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচারের চেষ্টা করে, সে নাস্তিক সমাজ বহিষ্কৃত হবে।[৩৩] একইভাবে কুমারিলও শ্রুতি তথা অপরাপর শাস্ত্রের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে ওইসব শাস্ত্রীয় বিষয়ে যুক্তি বা ন্যায়ের প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ধর্ম ও অধর্ম অনুধাবনের সময় তা বিহিত না অবিহিত, তার নির্ণয় ন্যায় বিচারের পথে হবে না। এমনকি যে অর্থবাদ আপাতদৃষ্টিতে যুক্তির দ্বারা বেদবাক্যের মূল্যায়ন বলে মনে হয়,

[৩৩] যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকোবেদনিন্দকঃ।। মনুসংহিতা- ২/১১।

মীমাংসকদের দৃষ্টিতে তা বিচারবোধের দ্বারা শাস্ত্র বাক্যের মূল্যায়ন নয়। বরং সেগুলি আসলে প্রশস্তি বাক্য। বৈদিক বিধি যে বৌদ্ধিক সমর্থনের অপেক্ষা রাখে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রভাকর। তাঁর দাবি বেদবাক্য স্বয়ংসিদ্ধ, স্বপ্রমাণ, কোনো বৌদ্ধিক সমর্থনের অপেক্ষা তাদের নেই।

এভাবে ভারতীয় ঐতিহ্যে যুক্তির ভূমিকাকে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে নগণ্য করে দেখানো হলেও নৈতিক বিচারে যুক্তি যে পুরোপুরি মূল্যহীন নয়, সেকথাও কিছু ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতির বিচার যে শাস্ত্রীয় ধারার পরিপন্থী নয়, বরং তা শাস্ত্রীয় নির্দেশকেই মহিমান্বিত করে, বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কের দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতির উপলব্ধিই যে শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি, সেকথা কবুল করেছেন মনু—

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা।।[৩৪]
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাঽবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধতে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।।[৩৫]

যে বিষয় অনুমানের অগম্য এবং শাস্ত্র পাঠের দ্বারা উপলব্ধির অতীত, সেখানে শাস্ত্রবাক্যে আস্থা স্থাপন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর দ্বারা শাস্ত্রের বিষয়ে আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপনই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেকথা ঘোষিত হলেও অনুমান বা যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্রীয় বাক্যের উপলব্ধি যে অসম্ভব নয়, পরোক্ষে সেকথাও নির্দেশিত হয়েছে। যদিও একইসঙ্গে অনুমান বা যুক্তি যে নৈতিক প্রশ্নে চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়, সেকথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু ভাবধারার তুলনায় তান্ত্রিক ভাবধারায় নৈতিক প্রশ্নে যুক্তি দ্বারা বিচারের অবকাশ অনেক বেশি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, সেখানে এই

---

৩৪ তদেব, ১২/১০৫।

৩৫ তদেব, ১২/১০৬।

দুই নাস্তিক ঐতিহ্যে যুক্তি অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন মহাবীর বলেছেন, 'আনায়েমামগম্ ধর্মম' অর্থাৎ আমার উপদেশই ধর্ম। একইভাবে তাঁর নির্দেশিত পথই যে একমাত্র মার্গ সেকথা মহাপরিনির্বাণের পূর্বে নিকটতম শিষ্য আনন্দের কাছে ব্যক্ত করেছেন তথাগত। তবে যে চারটি আর্যসত্যের শিক্ষা বুদ্ধ রেখেছেন, সেগুলি চূড়ান্ত এবং অনুসরণীয় হলেও যুক্তির দ্বারা সেই মত ও পথের যথার্থতা বিচারের ব্যাপারে কোনো নিষেধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য ছিল না। যেখানে মতানৈক্য দেখা যাবে, সেখানে সংশয় নিরসনের জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসার উপদেশ করেছেন বুদ্ধ। ইংরেজি পরিভাষার সাহায্য নিয়ে বলা যায়, বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব 'Autonomus' নয় 'Heteronomus'। বুদ্ধের অনুশাসন বৌদ্ধধর্মে চূড়ান্ত মর্যাদা পেলেও নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি দিয়ে যে মার্গকে প্রকৃত মার্গ বলে মানুষ গ্রহণ করে, তার সঙ্গে বুদ্ধ প্রচারিত নীতিশিক্ষার কোনো বিরোধ নেই। বৌদ্ধ নীতিতত্ত্বের এটিই হল মর্ম কথা। অনুশাসনের অন্ধ অনুগমনকে সমর্থন করা হয়নি জৈন দর্শনেও। জৈন ধর্মেও প্রকৃত অনুসরণের উপদেশই মূল উপদেশ। জৈন ত্রিরত্নের আদর্শে সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, ও সম্যক চরিত্র এই তিনটিকে রত্নের ন্যায় ধারণের উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাই বলে জৈন অনুশাসনের অন্ধ অনুশীলন সেখানে উপদিষ্ট হয়নি। অনুশীলনের আগে তীর্থঙ্করদের দ্বারা নির্দেশিত পথকে বিচার করে দেখার কথাও সেখানে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জৈন মতে সম্যক দর্শন হল আস্থা সহকারে তীর্থঙ্করদের শিক্ষাকে গ্রহণ। সহজ কথায় এ হল তীর্থঙ্কর উপলব্ধ শিক্ষায় আস্থা স্থাপন। সম্যক জ্ঞান হল সেই গৃহীত সত্যের বিচার বা মনন। আর সম্যক চরিত্র হল সেইসব উপলব্ধ সত্যের আচরণ বা অনুশীলন। সুতরাং যা প্রচারিত, তা আচারের নির্দেশ জৈন দর্শন দেয় না, যুক্তির আলোকে তার বিচারও প্রস্তাব করে।

সমকালীন হিন্দু চিন্তাবিদরা নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তির ভূমিকা মেনে নিয়েছেন। এ-ব্যাপারে বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। চিরাচরিত হিন্দু ঐতিহ্যে আস্থা রেখে এঁরাও শাস্ত্রাদিকেই নৈতিক আদর্শের উৎস হিসাবে গ্রহণ করেন, যুক্তিকে নয়। কিন্তু যদি কোনো শাস্ত্র উপদেশ যুক্তি বিরোধী হয়, তাহলে সেই উপদেশকে পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন এঁরা। এ-ব্যাপারে গান্ধীর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট,

> I can not let scriptural text supersede my reason. Whilst I believe that the principal books are inspired, they suffer from a process of double distillation. Firstly, they come through a human prophet, and then through the commentaries of interpreters. Nothing in them comes from God directly…..I cannot surrender my reason while I subscribe to divine revelation.[৩৬]

অর্থাৎ শাস্ত্রের নির্দেশকে তার বিচার বুদ্ধির উপরে স্থান দিতে রাজি নন গান্ধী। এর সপক্ষে তাঁর সাফাই যে, সব শাস্ত্র উপদেশ আমাদের হাতে এসেছে, সেগুলি সরাসরি ঈশ্বরের উপদেশ নয়। প্রথমে কোনো মহাপুরুষের মনের মধ্যে তা উদিত হয়েছে, তারপর কোনো ভাষ্যকার তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই দ্বিবিধ পরিশোধনের মধ্য দিয়ে যা আমাদের কাছে এসেছে, তার কতখানি ঈশ্বর নির্দেশিত তা বলা মুশকিল। তাই ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশকে গ্রহণ করার সময় নিজের বিচারবুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না তিনি।

এ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে, ভারতীয় পরম্পরায় যুক্তির ভূমিকা নগণ্য নয়। কাজেই যেসব ক্ষেত্রে শাস্ত্রে হিংসা, প্রণতিপাত, পশুবলি ইত্যাদির বিধান আছে, সেইসব ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ করে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করা উচিত। কাজেই আপাত দৃষ্টিতে বেদ বা শাস্ত্রবিহিত যে সকল কর্ম, পরের অনর্থ সূচনা করে বলে মনে হয়; স্থান, কাল ও

---

[৩৬] Harijan, Dec., 1936.

ব্যক্তির প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সেগুলির লঙ্ঘনও সম্ভব। এভাবে দেখলে পরকল্যাণের ভাবনাটি যুক্তিবোধ দ্বারাও সমর্থিত বলা চলে।

৫.১.৮ নাস্তিক প্রস্থানে পরার্থবোধ

গীতা উপনিষদের এই ভাবধারা আস্তিক্যবাদী প্রায় সব দর্শনেই অব্যাহত। কোথাও আপনার মতো অপরকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে গণ্য করে, কোথাও আবার অপরের সঙ্গে আপনাকে একই শুদ্ধ সত্তার প্রতিবিম্ব হিসাবে ব্যাখ্যা করে পরহিতের পথ নিশ্চিত করা হয়েছে। পরহিতের এই ভাবনা নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও অব্যাহত থেকেছে। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'— বুদ্ধের এই নৈতিক আদর্শ আসলে লোকহিতে আত্মোৎসর্গের আদর্শ। লোকসংগ্রহের গীতোক্ত আদর্শ রূপান্তার লাভ করেছে বৌদ্ধ ও জৈন ঐতিহ্যে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ— এই পঞ্চশীল বা ব্রতের মোড়কে যে আদর্শের পথে জীবনযাপনের উপদেশ এই শাস্ত্রদুটি করে, তা আসলে পরহিতে আত্মোৎসর্গের উপদেশ। ব্রহ্ম স্বীকার না করলেও মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, ও উপেক্ষার দ্বারা ব্রাহ্মবিহারের যে উপদেশ বৌদ্ধাচার্যরা করেছেন, তার সুফল বর্হিমুখী, আত্মমুখি নয়। সুতরাং আস্তিক ও নাস্তিক প্রায় সকল ভারতীয় শাস্ত্রই প্রকারন্তরে হিতবাদেরই অনুশীলন।

৫.২ প্রসঙ্গ নৈতিক কর্মের স্বাধীনতা: কিছু আপত্তি

নৈতিক ক্রিয়ার স্বাধীন কর্তা হিসাবে একজন ব্যক্তির মধ্যে পরের জন্য কিছু করার চিন্তা কীভাবে আসে, তার নানাবিধ উত্তর দানের চেষ্টা আমরা ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিত থেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে নৈতিক কাজের স্বাধীনতা বলে কিছু রয়েছে কী? পরার্থে কর্ম করার কোনো স্বাধীনতা ভারতীয় পরম্পরা অনুমোদন করে কি?

অনেক পাশ্চাত্ত্য চিন্তক দাবি করেন যে, বিচারের মাধ্যমে নৈতিক কর্তার কোনটি কর্তব্য সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো সুযোগই ভারতীয় ঐতিহ্যে নেই। এই আপত্তি যেমন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রসূত বা তার কুসংস্কারসম্পন্ন মনোভাব প্রসূত, তেমনি এরকম আপত্তি উত্থাপিত হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। পূর্বাচার্য ও পরম্পরাকে স্বীকার করে জীবনচর্যার একটা রীতি যে ভারতীয় ভাবধারায় রয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। পরম্পরা সূত্রে যে নৈতিকতার অধিকারী আমরা হয়েছি, তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার অনুমোদন ভারতীয় শাস্ত্রগুলি দেয় না। এককথায় নৈতিক সংশয়বাদকে প্রশ্রয় দেয় না ভারতীয় ঐতিহ্য। 'সংশয়ী আত্মার বিনাশ অনিবার্য'[৩৭]— এরকম একটা ভাবধারা শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে। কাজেই কেন আমি একটি কর্ম সম্পাদন করব? কেনই বা অন্য একটি কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থাকব? সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ভারতীয়দের ততখানি তাড়িত করে না। ভাবটা অনেকটা এরকম, ওইসব বিধিনিষেধ স্বতঃ সিদ্ধ, স্বতঃ বৈধ। তাদের বৈধতা প্রশ্নাতীত। সুতরাং সংস্কারমুক্ত বিচারবাদী মন নিয়ে সম্ভাব্য বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি করা উচিত হবে, তা নির্ধারণের কোনো সুযোগই এই দর্শনে নেই। এই আপত্তিটি যে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়, একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। নীতিবিদ্যা বা নৈতিক দর্শনের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ফ্রাঙ্কেনা বলেছেন, যখন প্রথাসিদ্ধ কর্মনীতিগুলির প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব মেনে নেওয়ার পরিবর্তে আমরা সেগুলির বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই তখন নীতি দর্শনের সৃষ্টি হয়।[৩৮] অর্থাৎ জীবনে সমস্যা ও দ্বন্দ্ব দেখা না দিলে নীতিচিন্তার উদ্ভব হয় না। যখন কোনো ব্যক্তি এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়,

---

[৩৭] 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' -শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৪/৪০।

[৩৮] "Moral Philosophy arises when … we pass beyond the stage in which we are directed by traditional rules … to the stage in which we think for ourselves in critical and general terms." –*Ethics* (2nd Ed.). William K Frankena, P. 4.

যেখানে তার মনের মধ্যে দুটি বিপরীত মনোভাব দেখা দেয়, একবার মনে হতে থাকে যে প্রথম কাজটি করণীয়, এবং পরক্ষণেই মনে হতে থাকে যে দ্বিতীয় কাজটি করণীয়, তখন ওই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে গিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার একটা অধিকার তিনি লাভ করেন। এই স্বাধিকার তাকে নৈতিক চিন্তায় এবং নৈতিক সিদ্ধান্তের মুখে চালিত করে। এখন সব কর্মই যদি শাস্ত্রবিহিত হয়, তাহলে নৈতিক কর্তার স্বাধিকার থাকবে কোথায়? বিধি নিষেধকে মেনে চলা ছাড়া যেখানে নৈতিক কাজের কর্তার কিছুই করার নেই, সেখানে কেন তিনি ওইরূপ কর্ম করবেন? কেনই বা তিনি নৈতিক জীবন যাপন করবেন, তার সপক্ষে কোনো যুক্তি শাস্ত্র অনুসরণকারীর কাছে থাকে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, শাস্ত্র কথাটি শাস্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ নিয়ন্ত্রণ। শাস্ত্র হল অনুগামীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি মাধ্যম। কুণ্ঠাহীনভাবে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মেনে স্ব স্ব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করায় হল শাস্ত্র অনুগামীদের একমাত্র লক্ষ্য। এই ধারার আচরণ তার এবং সমাজের পক্ষে হিতকর— এটাকে পূর্বস্বীকার্য হিসাবে মেনে নিয়েই তাকে চলতে হয়।

৫.৩ নৈতিক কর্মের সম্ভাবনায় আপত্তির নিরাস

এই পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে মনে হতে পারে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে কোনো নৈতিক কর্মই স্বাধীন কর্ম নয়, সেই কারণেই পরার্থ প্রবৃত্তির কোনো স্বাধীন প্রণোদন সেখানে থাকতে পারে না। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, কোনো কিছু শাস্ত্রীয় বা ঋষিবচন বলেই যে অন্ধভাবে তাকে অনুসরণ করতে হবে, এমন দাবি ভারতীয় পরম্পরাও করে না । এ-প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ীর উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিটি সর্বজনবিদিত— "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো"[৩৯]। কাজেই শুধু দর্শন বা

[৩৯] বৃহদারণ্যক উপনিষদ - ২/৪/৫।

শ্রবণ নয়, মনন বা বিচারই যে নিদিধ্যাসন বা ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তকে নিবিষ্ট করার মূলে রয়েছে তা বলাই যায়। এমনকি যে মীমাংসা শাস্ত্রে বেদবিহিত কর্মকে ধর্ম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, সেখানেও হিংসা বা হত্যা সংক্রান্ত বিধিবাক্যগুলি, যেগুলির পালন অনর্থের জন্ম দেয়, সেগুলি লঙ্ঘনের বিধান আছে। অবশ্য শাস্ত্রীয় বিধানকে প্রশ্নাতীত ভাবে মান্য করার একটা বাধ্যবাধকতা নৈতিক কর্তার মধ্যে থাকলেও, কেন কিছু নির্দিষ্ট অনুশাসন করণীয় বা নৈতিক জীবন যাপন আমাদের কর্তব্য, সে ব্যাপারে যথেষ্ট জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় ভারতীয় ঐতিহ্যে। অনুশীলন বা অনুসরণের ব্যাপারে নির্বিচারবাদীতাকে প্রশ্রয় দিলেও কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে দীর্ঘ বিচারের দাবি রাখে ভারতীয় শাস্ত্রগুলি। কেন মানুষ নৈতিক কাজ করে বা নিজের স্বার্থের বিনিময়ে অন্যের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হয়, সেই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে।

ভারতীয় দর্শন যেহেতু মোক্ষবাদী দর্শন, তাই এটা প্রথমেই বলে দেওয়া যায় যে, মোক্ষ লাভের কারণেই নৈতিক জীবন যাপন। কী উদ্দেশ্যে বা কোন অভিলষিত বস্তুকে পাওয়ার লক্ষ্যে নৈতিক বা ধর্মীয় জীবন যাপন, এখানে তার একটাই উত্তর, মোক্ষ। ভারতীয় ঐতিহ্যে মোক্ষই নৈতিকতার প্রেরণা বা তাড়না, মোক্ষই পরম পুরুষার্থ আর ধর্ম বা নৈতিকতা হল তা লাভের উপায়। মোক্ষই সেই পরম লক্ষ্য যা ব্যক্তিকে শুধু বিশেষ বিশেষ কর্মে প্রণোদিতই করে না, নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করে চলতে, এককথায় জীবনের নৈতিক ধারাকে বেছে নিতে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু মোক্ষ বড়োজোর নৈতিক জীবনের প্রেরণা বা তাড়না হতে পারে, একে নৈতিক জীবন যাপনের সপক্ষে বৌদ্ধিক যুক্তি বলে দাবি করা যায় না। প্রথমত, যুক্তি বলতে যদি তর্কশাস্ত্রীয় ভিত্তিকে বোঝায়, তা হলে একথা স্পষ্ট বলে দেওয়া যায় যে, মোক্ষ নৈতিক জীবনের ওইরকম যৌক্তিক ভিত্তি হতে পারে না। কেনো মানুষ নৈতিক জীবনকে বেছে নেবে তার সপক্ষে আদৌ কোনো

হেতুবাক্য এই উত্তর থেকে পাওয়া যায় না। কাজেই নৈতিক জীবনের বৌদ্ধিক ভিত্তিভূমি ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে কী হতে পারে তা বিচার্য বিষয়। তবে সে বিচারের পূর্বে একটি প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। প্রশ্নটি হল মোক্ষ কি আদৌ ধর্মীয় বা নৈতিক জীবনের একটি প্রেরণা হতে পারে? প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক, কারণ কোনো বিষয় কোনো কাজের প্রেষণা বা প্রেরণা হতে পারে তখনই, যদি ওই বিষয়টা আকর্ষণীয় বা মূল্যবান হয়। নৈতিক জীবন বা ধর্মের জীবন এই অর্থে আকর্ষণীয় নয়। প্রশ্ন হল মোক্ষ কি নৈতিক জীবনের তুলনায় আকর্ষণীয় বা মূল্যবান?

প্রশ্নটির আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতীয় দর্শনে মোক্ষের ধারণাটি সর্বত্র একরকম নয়। তা সত্ত্বেও নানা সম্প্রদায়ের মোক্ষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি একটি বিন্দুতে এসে মিশে যায়। কিছু সাধারণ মত রয়েছে, যেগুলিতে ভারতীয় দর্শনের ঐক্যমত্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন মোক্ষ হল এক উত্তেজনা রহিত, নির্মল এবং অন্তহীন সুখ ও প্রশান্তির অবস্থা। এ হল সর্বাধিক দুঃখ যন্ত্রণার চিরতরে নিরসন। জন্ম-মৃত্যু চক্রের চিরসমাপ্তি ঘটে এই মোক্ষে। এ এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ তার চিরঈপ্সিত ঈশ্বরাদি পরম লক্ষ্যে উপনীত হয় বা সান্নিধ্য লাভ করে। এসব বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মোক্ষ তত্ত্বগত একটা অবস্থা, যাকে নানাভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু এরকম একটা অবস্থাকে কি আকর্ষণীয় বিষয় বা পুরুষের অভিলাষিত বলে বর্ণনা করা যায়? শাশ্বত সুখ ও প্রশান্তির জীবন কি আকর্ষণীয় এক অবস্থা হতে পারে? অবশ্যই নয়, সর্বক্ষেত্রে তো নয়ই। সুখ প্রশান্তির জীবন তখনই ঈপ্সিত হয়, যখন যাপিত জীবনটি অশান্তি ও দুঃখে পরিপূর্ণ থাকে। কারণ অসুখের মধ্যেই মানুষ সুখ খোঁজে। অশান্তি থেকে মুক্তির জন্যই শান্তির খোঁজে উন্মুখ হয়। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে একথাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি দেখিয়েছেন, এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ প্রতিনিয়ত

আবর্তিত হচ্ছে, তা আসলে এক শান্তের সন্ধান করে চলেছে। চঞ্চল আছে বলেই অচঞ্চল শান্তের এত মূল্য। অমঙ্গল আছে বলেই মঙ্গল বা শিবের প্রতি এত আকর্ষণ। কবির ভাষায়—

> শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না - এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাহার প্রকাশ কোথায়। শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়?[৪০]

দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেই মানুষ সন্ধান করে প্রশান্তির। যদি কেউ শাশ্বত সুখের এক জীবন লাভ করে তাহলে সেই জীবন আর আকর্ষণীয় থাকে না। পরিবর্তনহীন সে জীবন এক একঘেয়ে ক্লান্তিকর পথচলায় পর্যবসিত হয় নাকি? শাশ্বত জীবনের মধ্যে সেই অর্থে কোনো আকর্ষণ থাকতে পারে না। তাই যা শাশ্বত, তা যে আকর্ষণীয় হবে আমাদের সাধারণ বিচার বুদ্ধি তা বলে না। শাশ্বত প্রশান্তির অবস্থা চিরমঙ্গলের অবস্থাও নয়। মূল্যের দিক থেকে বিচার করলেও মোক্ষ ধর্মের থেকে আবশ্যিকভাবে উচ্চতর নয়। যদি মোক্ষকে উচ্চতর বলা হয়ও, তবে প্রশ্ন উঠবে কেন তা উচ্চতর? সম্ভবত এর উত্তরে মোক্ষবাদীরা বলবেন এটিই পরমমূল্য বা লক্ষ্য তাই এর থেকে মূল্যবান কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় ঠিক কী কারণে তাঁরা মোক্ষকে পরম মূল্যের বা নিরতিশয় শ্রেয়ের মর্যাদা দেন? কোন অর্থে মোক্ষ শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য বা নিঃশ্রেয়স? কেন

---

[৪০] ধর্ম, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,পৃ. ৪৯১।

ধর্মকে সেই নিরতিশয় শ্রেয়ের মর্যাদা দেওয়া যাবে না? ধর্মকেই কি পরমমূল্য বলা যায় না? ঘুরে ফিরে উত্তর কিন্তু এক, মোক্ষ শাশ্বত সুখের জীবন দেয়, ধর্ম যা দিতে পারে না। মোক্ষকে লক্ষ্য করে ধর্মকে তার উপায় বলে দাবি করা একটি প্রচলিত কুসংস্কার বলে মনে হয়। আর এই কুসংস্কারকে হাতিয়ার করেই ধর্মের তুলনায় মোক্ষকে উচ্চতর স্থান দিই আমরা। অথচ মোক্ষ কোনো কালেই সাধারণ ভারতবাসীর লক্ষ্য ছিল না। কাম, অর্থ এবং অভ্যুদয় বা জাগতিক সুখ এবং সেই সুখের সরবরাহকে অব্যহত রাখার উপায় হিসাবে ধর্মের অনুশীলন গুরুত্ব পেয়ে এসেছে বরাবর। এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। বৈদান্তিক ভারতীয় ধারা ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র মোক্ষ অভিমুখী এবং জগতবিমুখ করে তুলেছে এমন আপত্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য লিখেছেন—

> খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সাধারণ ভারতবাসীর এ-মনোভাব ছিল না। অন্যান্য সব জাতির মত সেও রীতিমত জাগতিক অভ্যুদয়ের অনুশীলন করেছিল, ব্যবহারিক জগৎ-সভাতেই উচ্চ এক স্থান অধিকার করে রেখেছিল। ধর্ম নিয়ন্ত্রিত অর্থ কাম চর্চাই ছিল বহুতম ভারতবাসীর জীবনাদর্শ। ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম - ছিল নিয়ামক পুরুষার্থ মাত্র - বস্তুহীন নিয়ম সর্বস্ব কোনও ধর্ম অনুশীলিতব্য ছিল না, এবং চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের সাধনা 'কোটিতে গুটিকে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৪১]

তাছাড়া লক্ষ্যকে উপায়ের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া সবক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে আমরা গান্ধীজীর কথা ভাবতে পারি। তাঁর রচনায় বাপুজী লক্ষ্য ও উপায়কে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও মোক্ষকে উদ্দেশ্য করে ধর্মকে উপায় হিসাবে দেখাকে সমর্থন করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে কোনোকিছু প্রাপ্তির উপায় হিসাবে নয়,

[৪১] *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, কালিদাস ভট্টাচার্য, পৃ. ৩।

ধর্মের পালন ধর্মের কারণেই।[৪২] আবার নৈতিকতা বা ধর্মের পক্ষে যদি যুক্তির কথা ওঠে, তাহলে মোক্ষের ক্ষেত্রেই'বা সেই যুক্তি দাবি করা হবে না কেন? ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির দাবি করে মোক্ষের পক্ষে যুক্তির দাবিকে ছাড় দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। কারণ মোক্ষকে পরম লক্ষ্য হিসাবে চিরকালের জন্য স্থির করে দেওয়া একটি অবিচারিত সিদ্ধান্ত।

এ-পর্যন্ত ধর্মীয় জীবনের অন্তরালে কী প্রেষণা রয়েছে তার বিচার করেছি আমরা। এখন দেখা যাক যুক্তি শব্দের দ্বিতীয় অর্থে নৈতিক জীবনের সপক্ষে কোনো যুক্তি আছে কিনা? ধর্মের সপক্ষে কোনো যুক্তির সন্ধান যে ভারতীয় নৈতিক চিন্তার জগতে তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি, তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এখানে ধর্মীয় বা নৈতিক আচরণের যুক্তি হিসাবে আমরা সম্প্রদায় বা কর্তৃপক্ষের দোহায় দিতে পারি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করে ধর্মীয় জীবনের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ যে সম্প্রদায় বা গুরুকুলের পরম্পরার দোহায় দিয়ে একটি ধর্মাচারের যুক্তিসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেই সম্প্রদায়ের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে পারে। বস্তুত যুক্তির উপর নৈতিক আচরণকে দাঁড় করানোর চেষ্টা ভারতীয় নীতিতত্ত্বে খুব একটা হয় না। উচ্চতর নৈতিক নিয়ম থেকে কোনো বিশেষ নৈতিক নিয়মকে অবরোহণ করার যে ধারা পাশ্চাত্ত্য নীতিতত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়, ভারতীয় ঐতিহ্যে তা অনুপস্থিত। সুতরাং তর্কশাস্ত্রীয় উপায়ে নৈতিক কর্ম বা বিশেষ নৈতিক নিয়মকে যুক্তিসিদ্ধ করে তোলার কোনো রাস্তা এখানে খোলা নেই। ধর্মের সপক্ষে ন্যায়যুক্তি প্রদান তো দূরের কথা ধর্মীয় জীবনযাপনের সপক্ষে এরকম কোনো বৌদ্ধিক যুক্তি সন্ধান আদৌ সমীচীন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ভারতীয় ধর্মবিদদের। এ-ব্যাপারে প্রভাকর মীমাংসকদের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর।

[৪২] "ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, ... নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু – ধর্মেই ধর্মের শেষ।" - গান্ধারীর আবেদন, *কাহিনী*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ২৬।

তাঁরা মনে করেন ধর্মের সপক্ষে বুদ্ধির সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম নিজেই নিজের যুক্তি স্বরূপ— ধর্মের কারণেই ধর্মের জীবন ঈপ্সিত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, যে অর্থবাদের কথা মীমাংসা শাস্ত্রে রয়েছে, তার দ্বারা ধর্মীয় বিধিগুলির যৌক্তিকতা প্রদানের একটা চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল অর্থবাদের দ্বারা কেবলমাত্র প্রশংসা ও নিন্দার রাস্তা খোলা রেখেছেন এরা এবং এর দ্বারা বিধির সপক্ষে যুক্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অভিপ্রায় এই বেদবাক্যের যথার্থতায় যুক্তি প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যখন এক বিধিবাক্যের সমর্থনে অন্য বিধিবাক্যের উল্লেখ করা হয়, তখন বুঝে নিতে হবে দ্বিতীয় বিধিবাক্যের দ্বারা প্রথমটির প্রশস্তিই উল্লিখিত হয়, প্রমাণ নয়। কেননা বেদ স্বতঃ প্রমাণ। তাই বেদবাক্যের সমর্থনে প্রমাণান্তর নিষ্প্রয়োজন। এইভাবে যে কোনো নৈতিক অনুজ্ঞা বা ঔচিত্য বিষয়ক বিবৃতির ক্ষেত্রে বেদবাক্যই প্রমাণ।

সুতরাং ধর্ম বা নৈতিকতা ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কারণ যা নৈতিকতা বা ধর্ম তা শাস্ত্র নির্দেশিত আর শাস্ত্র অকুণ্ঠ আনুগত্য দাবি করে। শাস্ত্রীয় বাক্য সম্বন্ধে যেমন কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না, তেমনি তার সপক্ষে কোনো প্রমাণও দেওয়া যায় না। তবে এক অর্থে ভারতীয় দর্শনেও নৈতিক কর্ম ও নৈতিক নিয়ম পালনের সপক্ষে যুক্তি রয়েছে। কেন নৈতিক জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন— তার ব্যাখ্যাও রয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে মানুষের যে ধারণা, সেই ধারণা বিশ্লেষণ করলেই মানুষের নৈতিক হওয়ার পর্যাপ্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন অনুসারে মানুষ স্বরূপত আত্মা, আকস্মিকভাবে সে দেহের অধিকারী হলেও আত্মাই তার স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরে যে পৃথক পৃথক আত্মার বাস, সেই আত্মাগুলো পুরোপুরি এক না হলেও তাদের মধ্যে পর্যাপ্ত সাদৃশ্য রয়েছে। আর এই কারণেই সব মানুষের মধ্যে রয়েছে ঐক্য বা মিল। বেদান্তের দৃষ্টিতে

দেখলে সব জীব একই আত্মার প্রকাশ— "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"[৪৩]। একই আত্মার বিবিধ প্রকাশের মধ্যে নিজেকে দেখলে কেন মানুষ নৈতিক হবে, তার একটা যুক্তি সে খুঁজে পায়। সব মানুষ যদি স্বরূপত অভিন্ন হয়, এক আমিরই বিস্তার হয়; তা হলে অন্য সকলের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি, পারস্পরিক সহায়তার জীবন যাপন জরুরি হয়ে পড়ে। যেভাবে আমি নিজেকে দেখি, সেভাবেই অন্যকে দেখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যে দেহ ও ইন্দ্রিয় তার স্বরূপ ধর্ম নয়, যাদের সঙ্গে তার যোগ আবশ্যিক নয়— সেই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতে জীবন নির্বাহ না করে, যা শাশ্বত তার উপলব্ধিতে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ইন্দ্রিয় সংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের মাধ্যমে নিজের উত্তরণ ঘটিয়ে আত্মার স্বরূপকে উপলব্ধি করা তার কাছে স্বাভাবিক আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই আবেগের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে চিত্তকে শুদ্ধ করার পথে চালিত হয় মানুষ। এভাবে অপরাপর মানুষের সাথে তার সারূপ্য বা তাদাত্ম্য মানুষকে বাধ্য করে তোলে নৈতিক জীবনের পথ অনুসরণে। যদিও এখানে অন্য সকলের সঙ্গে নিজের ঐক্য উপলব্ধি থেকে নৈতিক জীবন যাপনের ঘটনাটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না, তথাপি প্রথম বিশ্বাসটি যে দ্বিতীয় বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি হতে পারে, তা অস্বীকার করা যায় না। 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'[৪৪]— এই বচনকে সত্য বলে যে বিশ্বাস করে, সে অবশ্যই নৈতিক জীবনযাপন করবে। নদীর তীরে বসবাস না করার যে নির্দেশ, তা ওই নদীতে বন্যা আসার ঘটনা থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে বিশ্বাস থাকলে প্রথমটিই মেনে চলতে হয়। এভাবে দ্বিতীয়টি যেমন প্রথমটির যুক্তি হতে পারে, সেভাবে সকলের সঙ্গে আপন তাদাত্ম্যের উপলব্ধি নৈতিক জীবনযাপনের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রণোদন হতে পারে।

---

[৪৩] *ভগবান শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা*, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), পৃ. ২০।

[৪৪] ঋগ্বেদ – ১/১৬৪/৪৬।

সুতরাং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে মানুষের নিজস্ব প্রকৃতিই তার নৈতিক জীবনের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়ায়। নৈতিকতা হয়ে দাঁড়ায় মনুষ্য তফাত সূচক একটি বৈশিষ্ট্য। নৈতিকতাই সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যা মানুষকে অন্য সকল পশু থেকে পৃথক করে। মানুষ হিসাবে প্রত্যেক মানুষের যেমন নিজের প্রতি কিছু দায় আছে, তেমনই অন্যের প্রতিও রয়েছে দায়িত্ব। এই দায়িত্ব বস্তুত নৈতিক বাধ্যতাকেই নির্দেশ করে। এই বাধ্যতাবোধ ও দায়বদ্ধতা মানুষকে যেমন একদিক থেকে নৈতিক করে তোলে, তেমনি অন্যদিক থেকে তাকে করে তোলে আধ্যাত্মিক। মানুষের এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কথা বিবেচনায় রেখেই শ্রেয় ও প্রেয় এর মধ্যে তফাত করা হয়েছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ অবশ্য নৈতিক জীবনযাপনের সপক্ষে আর একধরনের যুক্তির অবতারণা করেছেন। ঈশ্বরবাদী এই দার্শনিক ঈশ্বরকে পুরুষোত্তম হিসাবে দেখেন। সৃষ্টি স্থিতির কর্তা, জীবের কর্মফল দাতা ঈশ্বর তাঁর কাছে পরমাত্মা। অন্তঃস্থিত থেকে সমস্ত জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি। চিৎ-অচিৎ নির্বিশেষে জীব জড় সকলেই ওই ঈশ্বরের অংশ। সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বভূ এই ঈশ্বর অনন্ত সৎ গুণের আকর। নৈতিকতার পরম পরাকাষ্ঠা এই পরমেশ্বরের মধ্যে জ্ঞান, দয়া, ক্ষমা, মহানুভবতা ইত্যাদি সমস্ত নৈতিকগুণগুলি নিরতিশয় লাভ করেছে। মানুষ ওই পরম দিব্যত্বের ক্ষুদ্র কেন্দ্র বা দিব্যত্বের স্ফুলিঙ্গ। ঈশ্বরের মতোই সে সকল পরম গুণের ক্ষুদ্র অংশীদার। ওই দিব্যত্বকে জগতের মঙ্গলের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার দায় ঈশ্বরের মতো মানুষেরও রয়েছে। নৈতিক সদগুণগুলি ঈশ্বরের মতোই, সে যেগুলির অধিকারী, সেগুলির প্রকাশে মানুষেরও উচিত ঈশ্বরকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা। ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে ওইসব গুণগুলির অনুসরণ ও অনুকরণ তার নৈতিক দায়িত্ব। এই মত বাইবেলের সেই উক্তির মতো— "Be ye holy, as I, thy Lord, am Holy." একইভাবে রামানুজ বলবেন— "তুমিও নৈতিক হও

যেহেতু সেই পরম ঈশ্বরও নৈতিক বা নীতিবান"[৪৫]। যার মধ্যে যে গুণের অভাব আছে, ঈশ্বরই তাঁর মধ্যে সেই নৈতিক গুণ প্রদান করেন। অজ্ঞানে জ্ঞান, আর্তজনে দয়া, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের দ্বারা ঈশ্বর প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে নৈতিকগুণ সুপ্ত রয়েছে, তাকে উন্মোচিত ও উৎসারিত করার চেষ্টা করেন। আর এভাবেই যেসব সৎ গুণের তিনি নিরতিশয় সৃষ্টির মধ্যেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটান। মানুষের দিক থেকে স্রষ্টার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উপায় হল ওইসব গুণাবলিকে নিজের মধ্যে বেশি বেশি মাত্রায় প্রকাশ করা। কাজেই মানুষের দিক থেকে নৈতিক জীবন যাপনের সবথেকে বড়ো দায় হল এই যে, ঈশ্বর তার কাছে ওইরূপ জীবন প্রত্যাশা করেন। মানুষের কর্তব্য হল ঈশ্বরের গুণাবলিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত করা, ঈশ্বরকে অনুকরণ ও অনুসরণ করা, এই কর্তব্যবোধই মানুষকে নৈতিক জীবন বেছে নিতে বাধ্য করে। কাজেই রামানুজের দর্শনের দিক থেকে বিচার করলে স্রষ্টা প্রভু ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে গিয়ে মানুষের নৈতিক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

এ পর্যন্ত নৈতিকতার সপক্ষে যে প্রমাণ ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলি সবই আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে গঠিত। তাই সঠিক অর্থে এদের প্রমাণ বলে গণ্য করা কতখানি সমীচীন, সে প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ অধিবিদ্যা ও আধিবিদ্যক বিশ্বাসকে নৈতিকতার সপক্ষে প্রমাণ বলা যায় না। বিশেষত ঘটনা বিষয়ক কোনো বিবৃতি থেকে ঔচিত্য বিষয়ক বিবৃতিকে নিঃসৃত করা যায় না। যা হয়, তা থেকে যা হওয়া উচিত, তা আসে কী করে? এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, এখানে যে প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, তা অবরোহাত্মক কোনো প্রমাণ নয়। অবরোহ অনুমানে যেভাবে হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়, সেখানে পরাবিদ্যাগত বিশ্বাস থেকে নৈতিক

[৪৫] *Classical Indian Ethical Thought*, Kedar Nath Tiwari, p. 252.

সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় না। আসল কথা হল পরাতাত্ত্বিক বা আদর্শ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে পূর্বস্বীকার্য হিসাবে মেনে নিতে না পারলে, নৈতিক জীবনাচার ভিত্তি খুঁজে পায় না। সুতরাং নৈতিক বাধ্যতাবোধ কিছু আধিবিদ্যক পূর্বস্বীকার্যের অপেক্ষা রাখে।

উপসংহার

উপসংহার

এই গবেষণা নিবন্ধের অভিমুখ ছিল সমকালীন ভারতীয় মনীষীদের চিন্তার আলোকে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের যৌক্তিকতা বিচার। ঠিক কোন প্রণোদন থেকে একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি মানবিক আচরণ করবে সেই প্রশ্নটিকে সামনে রেখে যেসব সমাধান পাশ্চাত্ত্য দর্শন আমাদের সামনে রেখেছে তার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি সমাধান আমরা পাই মিল, বেন্থাম ও তাদের অনুগামী উপযোগবাদীদের কাছে। সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের উপযোগবাদী আদর্শ প্রাথমিকভাবে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়। কারণ এই আদর্শ ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে মানুষকে আটকে না রেখে সমাজকল্যাণ ও মানবকল্যাণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। যে সমাজে ব্যক্তি মাত্রই আত্মকেন্দ্রিক, যে সমাজ স্বার্থ হানাহানিতে দীর্ণ, সেই সমাজে নৈরাজ্য দেখা দিতে বাধ্য; আর সেই নৈরাজ্য ধ্বংসের পথকেই প্রশস্ত করে। সমাজরক্ষা এবং সেইসঙ্গে আত্মরক্ষার স্বার্থে পরকল্যাণের আদর্শ মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের কাছে উপায়ান্তর নেই। আর সেই পরকল্যাণের পথই বাতলে দেয় পরসুখবাদ তথা উপযোগবাদ। সুতরাং আদর্শ হিসাবে তার যে একটা জোরালো গ্রহণযোগ্যতা আছে তা মেনে নিতে হয়। মিল বেন্থামীয় এই তত্ত্বের আর একটি লক্ষণীয় সুবিধার দিক বলে যেটা অনেকের কাছে বিবেচিত হয় সেটা হল এই মতবাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা। বিজ্ঞানমনস্কতার এই যুগে শুধু বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে, অতিলৌকিকের কাছে আবেদন রেখে কোন কিছুকে গ্রহণ করতে চায় না মানুষ। যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে সত্যাসত্য বিচার করে ব্যবহারে তাকে রূপ দেয়। নৈতিকতার এই যৌক্তিক ভিত্তিভূমিটি সরবরাহ করার চেষ্টা করে উপযোগবাদ। যুক্তির কাছে আবেদন রেখেও যে নৈতিক

জীবনযাপনকে সমর্থন করা যায়, পরকল্যাণের ভাবনাকে উৎসাহ প্রদান করা যায় সেকথাই ব্যক্ত করে এই মতবাদ। শুধু তাই নয়, প্রয়োগের দিক থেকেও এই মতবাদ কর্মক্ষম বলে মনে হয়। সর্বজনের কল্যাণ সাধন আদর্শ হিসাবে যতই শ্রেয় হোক না কেন ব্যবহারে তাকে কার্যকরী করা সম্ভব বলে মনে হয় না। জীবকুল পরস্পরের সঙ্গে এমনই একটি সম্বন্ধে আবদ্ধ যে একের সুখ বৃদ্ধি করতে গেলে অন্যকে অসুখী না করে উপায় নেই। অভিব্যক্তির নিয়মই হল এক শ্রেণীকে ব্যবহার করে অন্য শ্রেণীর উদ্গতি। এভাবেই উদ্ভিদকুলের উপর বেঁচে থাকে প্রাণীকুল। আবার এক প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে অব্যহত থাকে আর এক প্রাণী। উপায় হিসাবে একদলকে ব্যবহার করে অন্যদলের পরিপূর্তি ও উন্নতির এই পরম্পরা মানব সমাজেও অব্যহত। সেখানেও এক দলের অকল্যাণ ছাড়া যেন অন্যদলের কল্যাণ সাধিত হয় না। তাই কিছু সংখ্যকের কল্যাণসাধন সবক্ষেত্রেই অধরা থেকে যায়। এমত অবস্থায় যে ব্যবস্থা সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক পরিমাণ হিতসাধনকে নিশ্চিত করে তাকে গ্রহণ করাই বিচক্ষণতা বা বাস্তববাদী সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়।

হয়তো এইসব কারণে আধুনিক ইউরোপে এই নীতিতত্ত্ব সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ইউরোপীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো অনেকখানি এই উপযোগবাদী নীতিচিন্তাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। চার্চ, পোপ বা ঈশ্বরাদেশ নয়, রাষ্ট্রের পরিচালনা হোক সর্বাধিকের কল্যাণ নিশ্চিত করার নীতি অনুসারে – এই ভাবনাই গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল। এখন যাকে আমরা গণতন্ত্র বলে বুঝি, তা ইউরোপ, আমেরিকা বা ভারতবর্ষ যেখানেই হোক না কেন তা আসলে সর্বাধিকের শাসনতন্ত্র; অর্থাৎ সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের

উদ্দেশ্যে সর্বাধিক সংখ্যকের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচালনায় থাকা একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সুতরাং শুধু দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে নয়, ব্যবহারিক কৌশল হিসাবেও উপযোগবাদের যে একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে তা কখনই অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সম্ভাব্য সকল বিকল্পের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় বলে কোন তত্ত্ব বা মতবাদ দার্শনিকের ছাড়পত্র পেতে পারে না। তাই নৈতিক তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ কতখানি যুক্তিসম্মত সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। নৈতিক তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদের যে নানা অসুবিধার দিক রয়েছে পাশ্চাত্ত্য নীতিতাত্ত্বিকদের অনেকেই সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষত সর্বাধিকের স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সর্বন্যুন্যের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া তাঁদের অনেকেই সমর্থন করেননি। যে নিয়ম বা কর্ম মুষ্টিমেয়ের কল্যাণ বা সুখের বিনিময়ে অধিকাংশের স্বার্থরক্ষা করতে চায় – পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও তা নীতিগত ভাবে যথার্থ হতে পারে না।

এবার ফেরা যাক উপযোগবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তাবিদদের মূল্যায়নে। মিল-বেন্থামীয় তত্ত্বের একটা প্রভাব ঊনবিংশ শতকের শুরুর দিকে ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যে পড়েছিল তা আমরা দেখেছি। বিশেষত রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা তথা কর্মপ্রয়াসে উপযোগবাদী মনোভাবের পরিচয় আমরা পায়। ধর্মকে সুখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করার বঙ্কিমীয় প্রচেষ্টা যে অনেকখানি মিল বেন্থামের প্রভাবে তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশেষত ষোল আনার হিতসাধন যে আদর্শ মাত্র এবং কখনই তা বাস্তবায়নযোগ্য নয় তা বঙ্কিম নিজেই কবুল করেছেন। ষোল আনার কল্যাণকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলেও বাস্তবে যে তা বড়জোর বারো আনার হিতসাধন করতে পারে তা বঙ্কিম অস্বীকার করেননি। কিন্তু

প্রাথমিকভাবে ইউটিলিটিতত্ত্ব যতই উপযোগী ও কার্যকরী বলে মনে হোক, চূড়ান্ত বিচারে তা সমকালীন ভারতীয় চিন্তকদের অধিকাংশের অনুমোদন পায়নি। এর কারণ হয়তো এই যে, ভারতীয় পরম্পরায় জাগতিক সবকিছুকে এক অদ্বৈত সত্তার প্রকাশ হিসাবে দেখা হয়েছে। সকল জীবই নারায়ণের অংশ[১]— এই বিশ্বাস সমকালীন ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যেও অত্যন্ত প্রবল। সব কিছুই যদি একের প্রকাশ হয় তাহলে সর্বভূতের হিতসাধনই মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত; তার একাংশের এমনকি সর্বাধিক অংশের হিতসাধন আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে না। তাছাড়া সর্বাধিক সংখ্যকের কল্যাণ যদি কারও ঈপ্সিত হয় তা যে সর্বকল্যাণেই পর্যবসিত হয় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এক শতাংশের তুলনায় দশ শতাংশ যদি অধিক হয় তাহলে একই যুক্তিতে আশি শতাংশের তুলনায় একশ শতাংশ যে অধিক হবে তা স্পষ্ট। তাই সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণ যার নৈতিক আদর্শ তিনি সর্ব মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করতে বাধ্য। তাছাড়া আত্মসুখের মধ্যে নিমগ্ন না থেকে যখন পরসুখে মানুষকে ব্রতী হতে উপযোগবাদীরা বলেন তখন তারা কোন যুক্তিতে বহুর স্বার্থে একের আত্মত্যাগকে সমর্থন করেন? যদি ওই বহুর সঙ্গে নিজের ঐক্য মানুষ উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে তার আত্মত্যাগ নিরর্থক হয় না কি? এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র বিচারশীলতায় ভর করে আত্মত্যাগের ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। বৌদ্ধিক নৈতিকতার কথা আমরা বলি বটে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্বের যিনি একজন প্রধান প্রবক্তা, সেই ইমানুয়েল কান্টও নৈতিকতার পূর্বস্বীকার্য হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে মেনে নিয়েছেন। এরকম একটা বিশ্বাসকে

[১] *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, কালিদাস ভট্টাচার্য, পৃ.২।

পূর্বস্বীকার্য হিসাবে ধরে না নিলে পরকল্যাণের ভাবনা কতখানি প্রশ্রয় পাবে সে ব্যাপারে সংশয় থেকেই যায়।

এই পর্যন্ত সমকালীন ভারতীয় মনীষীরা যেসব যুক্তিতে উপযোগবাদী মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হল— প্রয়োজনের বিচারে কোন নৈতিক আদর্শ গড়ে উঠতে পারে না। আর যেখানে সর্বভূতের কল্যাণই ঈপ্সিত সেখানে আত্মকল্যাণ কিংবা সর্বাধিক সংখ্যকের কল্যাণ নৈতিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু এভাবে প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা ভারতীয় দার্শনিকদের পক্ষে সত্যিই কি সম্ভব? শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'প্রয়োজনমনুদিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ততে'[২]। অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে মন্দ ব্যক্তিও প্রবৃত্ত হয় না। প্রবৃত্তি মাত্রই উদ্দেশ্যমুখী। হান, উপাদান যেকোন প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে কোন জিহাসিত বস্তুর ত্যাগ কিংবা ঈপ্সিত বস্তুর গ্রহণ। ওই গ্রাহ্য বা তাজ্য বস্তু পুরুষার্থ হিসাবে গণ্য হয় ভারতীয় শাস্ত্র গুলিতে। এই পুরুষার্থ হয় অভ্যুদয় কিংবা নিঃশ্রেয়স অভিমুখী। বেদেও বলা হয়েছে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' অর্থাৎ আত্মার মুক্তি ও জগতের হিত দুই লক্ষ্যেই মানুষকে কর্ম করতে হবে। প্রশ্ন হল জগতের হিত যদি নৈতিক কর্মের একটি লক্ষ্য হয় তাহলে তার অপর লক্ষ্য আত্মার মুক্তি নয় কি? আত্মমুক্তি তা যতই সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে মনুষ্যের উত্তরণকে সূচিত করুক না কেন তা কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়?

তলিয়ে দেখলে ধরা পড়ে শুধু বেদ উপনিষদ কেন সমগ্র ভারতীয় দর্শনই আসলে মোক্ষশাস্ত্র। এব্যাপারে নাস্তিক ও আস্তিক প্রস্থানের মধ্যে তেমন একটা ইতরবিশেষ নেই। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন পদার্থ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের মধ্য দিয়ে মিথ্যা জ্ঞানের নিবারণ ঘটাতে

[২] শ্রীমদ্ভগবদগীতা (প্রথম ভাগ), শ্রীমধুসূদন সরস্বতী, পৃ. ১৬৮।

চায়। কারণ মিথ্যা জ্ঞান থেকে দোষ, দোষ থেকে প্রবৃত্তি হয়। আর প্রবৃত্তি দূর হয়ে গেলে জন্ম তথা দুঃখের উচ্ছেদ হয়ে যায়। সাংখ্য শাস্ত্রেও ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও তার পরিণাম থেকে পুরুষ নিজ ভেদজ্ঞান লাভ করতে পারলে অবিকারী পুরুষ কেবলস্বভাব প্রাপ্ত হন। এমনকি নাস্তিক বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও সেই মুক্তির সুরই অনুরণিত। বুদ্ধের আর্যসত্য চতুষ্টয়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তির নিদান। পঞ্চশীল ও ব্রহ্মবিহারের যে অনুশীলন বৌদ্ধশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে তার অভিমুখ হল নির্বাণ। জৈনদর্শনও মানুষকে মুক্তির পথই প্রদর্শন করে। ত্রিরত্ন ধারণ, মহাব্রত ও অনুব্রতের উদযাপন সবই জীবকে পুদগল মুক্ত করার প্রয়াস; তাকে স্বরূপে প্রকাশিত করার চেষ্টা। এভাবে আস্তিক ষড়দর্শনের মত নাস্তিক বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনেও মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভের স্বার্থে নৈতিক কর্ম উপদিষ্ট হয়েছে। নৈতিক কর্মকে সেখানে চিত্তশুদ্ধির উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এই বিবেচনা থেকে যে একমাত্র শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষেই মুক্তির সদর রাস্তায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

কাজেই ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্মের প্রণোদনও প্রয়োজন নিরপেক্ষ নয়। এখানে কেউ প্রতিবাদ করে বলতে পারে যে, নিষ্কাম কর্মের আদর্শও তো ভারতীয় দর্শন থেকে পাওয়া। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যে কর্মের উপদেশ রয়েছে তা সকাম নয় নিষ্কাম, যার পরিচয় অনাসক্ত কর্ম বা যজ্ঞার্থ কর্ম হিসাবে। এই অনাসক্ত কর্মের দুটি লক্ষণের কথাও বলা হয়েছে গীতায়– ফলাভিসন্ধিশূন্যতা এবং কর্তৃত্বাভিমানশূন্যতা। অনাসক্ত যোগী ফলের ইচ্ছায় যেমন কোন কর্ম করবেন না তেমনি 'আমি কর্ম সম্পাদন করছি' এরূপ অভিমানও তাঁর

থাকবে না। না থাকবে সুখে স্পৃহা, না থাকবে দুঃখে উদ্বেগ। ভয়, ক্রোধ বিনির্মুক্ত আসক্তিশূন্য যে কর্তা তাঁর ত্যাগাত্মক কর্ম উদ্দেশ্যমুখী হতে পারে কি?

কিন্তু এই সাফাই ঠিক কতখানি সন্তোষজনক সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ কর্ম মাত্রই উদ্দেশ্যমুখী। তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, গীতায় তিন ধরণের কর্মের কথা বলা হয়েছে— কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্ম[৩]। যে কর্মের কোন উদ্দেশ্যই নেই তা অ-স্বভাবী বা শিশুর কর্মের সদৃশ। সেরকম নিরর্থক কর্মকে 'নৈতিক' কর্মের অভিধায় অভিহিত করা যায় না। তাছাড়া গীতাকার যে কর্মের অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন তার অভিমুখ যে নেই তা তো নয়। ঈশ্বরের চরণে ওই কর্মকে সমর্পণের একটি সুপ্ত বাসনা কর্মযোগীর মধ্যে নিহিত থাকে। ওই কামনা হয়তো সাধারণ কামনা থেকে অত্যন্ত ভিন্ন; সেই সূক্ষ্ম অনুভূতির সঙ্গে স্থূল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির হয়তো কোন তুলনা হয় না। কিন্তু যত উচ্চ স্তরের মহতী ঈপ্সাই হোক, তা উদ্দেশ্যহীন নয়। একে ঠিক 'কর্মের জন্য কর্ম' বা কান্টীয় অর্থে কর্তব্যকর্ম বলা যায় না। আরেকটি বিষয়ও এখানে বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন যেটি কি ভারতীয় কি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদী উভয় প্রকার নীতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়। একটু গভীরে দৃষ্টি রাখলে ধরা পড়ে কি চিরাচরিত পাশ্চাত্ত্য, কি ধ্রুপদী ভারতীয়, উভয়বিধ নীতিতত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষ। যে মোক্ষের লক্ষ্যে নৈতিক কর্মের বিধান ভারতীয় শাস্ত্রগুলি দিয়েছে সেই কর্মের অভিমুখ হল মানুষের স্বার্থ, তারই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি। সেখানে অন্য জীবের স্বার্থের কথা বিবেচনায় রাখা হয়নি। শাস্ত্রীয় যজ্ঞে যে পশু বলির নির্দেশ রয়েছে বা যূপকাষ্ঠাদি সংগ্রহ করে অগ্নিহোত্রাদির বিধান রয়েছে সেগুলি সবই না-মানুষী জগতের স্বার্থের পরিপন্থী।

[৩] শ্রীমদ্ভগবদগীতা – ৪/১৭।

ইউটিলিটিতত্ত্বের সমর্থকরা যখন উপযোগের সর্বাধিকীকরণের কথা বিবেচনা করেন তখন তারাও মনুষ্যতরের উপযোগের কথা ভাবেন না। কি ভারতীয় কি পাশ্চাত্ত্য উভয় নীতিতত্ত্বই না-মানুষী জগতের প্রতি অনেকখানি উদাসীন। উদ্ভিদ থেকে পশু সকলকে উপায় হিসাবে ব্যবহারের বিনিময়ে মনুষ্যকূলের কল্যাণ বৃদ্ধির পথ বাতলাতে চান। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, পাশ্চাত্ত্যে যেখানে মনুষ্যতরকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করার পাশাপাশি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে তার স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে ব্যবহারকে অনুমোদন করে; সেখানে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি সমস্ত মনুষ্যকূলকে উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করে না-মানুষী জগতকে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের নিদান দেয়। কাজেই কান্টের শর্তহীন আদেশের দ্বিতীয় আকারটির কথা বিবেচনায় রাখলে ভারতীয় হিতবাদ কি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ উভয়ই সমদোষে দোষী বলে মনে হয়। তফাৎ শুধু এখানেই যে, ওই দোষের মাত্রা ভারতীয় হিতবাদীদের ক্ষেত্রে কিছুটা কম।

তবে এখানেও কিছু কথা উল্লেখের দাবি রাখে। বেদের আদিপর্বে যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করা হয়েছে, যাঁদের লক্ষ্য করে বারংবার স্তব, স্তুতি করা হয়েছে তাঁরা সকলেই প্রকৃতির কোন না কোন বিভাগের প্রতিনিধি। আদতে এই অর্চনা ছিল প্রকৃতিরই অর্চনা। অগ্নি, মরুৎ, বরুণ, ইন্দ্র, পর্জন্য, সূর্য, উষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী— এই সব দেবদেবীগণ বস্তুত প্রাকৃতিক শক্তির মূর্ত রূপ হিসেবে উপাসিত হয়েছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পঁচাত্তর সংখ্যক সূক্তটি নদীস্তুতি সূক্ত নামে এবং অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের প্রথম সূক্তটি ভূমি তথা পৃথিবীসূক্ত নামে পরিচিত। নিজের উৎপত্তি ও স্থিতির জন্য মানুষ যাদের কাছে ঋণী তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দেবতা। সেই দেবঋণ

পরিশোধের উদ্দেশ্যে যে যাগযজ্ঞাদি তা মূলত ত্যাগাত্মক কর্ম ছিল। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে প্রকৃতি অর্চনার পরম্পরা ভারতীয় ঐতিহ্যে এসেছে অনেক পরে। জগতকে এক অখণ্ড পরমের বিবিধ প্রকাশ হিসাবে দেখলে তার কোনো অংশকেই উপায় হিসাবে বা স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ হিসাবে যে ব্যবহার করা যায় না ঈশোপনিষদের ছত্রে ছত্রে তারই প্রতিধ্বনি শুনি আমরা। সেখানে সবকিছুকে এক পরমতত্ত্বের ঈশিত্বের দ্বারা আবৃত হিসাবে দেখা হয়েছে। সর্বভূতে নিজেকে দেখা বা নিজের মধ্যে সর্বভূতকে দেখায় যে অভ্যস্ত তিনি যে আত্মপর, মানুষ, না-মানুষ, জীব-জড় বিভাজন করতে পারেন না তার ইঙ্গিতও রয়েছে ঈশোপনিষদে। বিশেষত 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'[৪] এই আদর্শের যারা উত্তরসূরি স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে অন্যকে ব্যবহারের কোন পথই তার কাছে খোলা নেই, তা সে মানুষই হোক বা না-মানুষী জগত। একথা ঠিকই যে বাস্তুতন্ত্রের নিয়মে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধের অনুরোধে অন্যকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। সেই ব্যতিক্রমকে বিচারে রেখে নিজের প্রয়োজনে অন্যের প্রতি হিংসা এমনকি নাস্তিক দর্শনগুলিও সমর্থন করে না।

এপর্যন্ত যে আলোচনা ও বিশ্লেষণের অবতারণা হয়েছে তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, অপরাপর কর্মের মত মানুষের নৈতিক কর্ম উদ্দেশ্যমুখী, সে উদ্দেশ্য ঐহিক সুখ হোক কিংবা পারত্রিক মুক্তি। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, অন্যের হিতে নিজেকে প্রবৃত্ত করার স্বার্থক চাবিকাঠি কোনটি? বাহ্যিক কোনো দায়— তা সামাজেরই হোক, রাষ্ট্রেরই হোক কিংবা ধর্ম প্রতিষ্ঠানের, তা যে পরার্থ প্রবৃত্তির সঠিক প্রণোদন হতে পারে না সেকথা উপযোগবাদী মিলই স্বীকার করেছেন। শুধু যে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ও স্বার্থচিন্তা মানুষকে কর্তব্যমুখী করতে

[৪] মহোপনিষদ, ৬/৭১।

পারে না, তার সৎপথে চালিত হওয়ার মূলে যে অন্তরের বিবেকের শাসন আছে তা স্বীকার করেছেন তিনি; দেখিয়েছেন যে অসৎ পথে চললে মানুষ অন্তর থেকেই অস্বস্তি বোধ করে। এবং ওই অস্বস্তির পীড়া অসহনীয় হয় বলেই সে পরোপকার দ্বারা ওই পীড়ার লাঘব করতে চায়। মিলের মতে কর্তব্যের লঙ্ঘনজনিত যন্ত্রণার উপসম করাই মানুষের পরার্থকর্মের মূল প্রেরণা। এছাড়াও মিল এটা বিশ্বাস করেন যে, অপরের প্রতি সহানুভূতি মানুষের স্বাভাবিক আন্তর ধর্ম। সে কারণেই পরের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই এবং পরহিতের মাধ্যমে তা লাঘবের চেষ্টা করি। এভাবে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দায়ের পাশাপাশি নৈতিক কর্মের পেছনে যে তার অন্তরের একটা মানবিক দায় রয়েছে সেকথাও মেনেছেন মিল। তবে কিনা এর মধ্যেও একধরণের স্বার্থবুদ্ধির সন্ধান পেয়েছেন তিনি; যা তাঁর বর্ণনায় 'intelligent self-interest'[৫]।

এখন প্রশ্ন হল যদি অসহনীয় পীড়া লাঘবের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ স্বার্থবুদ্ধি প্রসূত হয়ে মানুষ পরহিতে প্রবৃত্ত হয়ও তথাপি জিজ্ঞাসা থেকে যায় অপরকে বঞ্চনা করে বা অপরকে দুঃখ দিয়ে সে আত্মপীড়া মানুষ অনুভব করে কেন? যে আন্তর তাগিদ বা মানবিকতা বোধের কথা মিল বলেছেন তার নিগড় কোথায়? অন্যের সঙ্গে নিজের বন্ধনের একটা যোগসূত্র খুঁজে না পেলে অন্যের জন্য করুণা বা সহানুভূতি— তাকে sympathy বা empathy যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, তার মধ্যে সঞ্চারিত হবে কেন? মিল ও তার অনুগামীরা যে সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলেছেন সেই কল্যাণের ধারণাকে পূর্বস্বীকার্য হিসাবে গ্রহণ না করে তার সর্বাধিকীকরণ— তা সংখ্যায় ও পরিমাণে

[৫] *Utilitarianism*, J. S. Mill, p. 97.

যা'ই হোক না কেন, ঘটানো যায় না। কল্যাণের এই ধারণাটি যাকে মেনে নিয়েই উপযোগবাদের পথ চলা তাকে কি আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্তভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? খ্রীষ্ট ধর্মের দীর্ঘ ঐতিহ্য কল্যাণের একটি নিটোল ধারণা মিলপন্থীদের মনে গড়ে দিয়েছিল বলেই কি তারা ওই কল্যাণের সর্বাধিকীকরণের উপায় সন্ধান করেননি? এরকম ভাবনা শ্রীঅরবিন্দও পোষণ করেছেন যে, এক পরম পিতার সন্তান হিসাবে সকলকে ভ্রাতা-ভগ্নী হিসাবে বিবেচনা করার যে বোধ খ্রিস্টীয় তথা ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে তা থেকেই কল্যাণের এর উপযোগবাদী ধারণাটি পুষ্ট হয়েছে উপযোগবাদীদের মধ্যে?[৬] যদি তাই হয় তাহলে বিশুদ্ধ বৌদ্ধিক ভিত্তিভূমির উপর পরার্থ প্রবৃত্তিকে দাঁড় করানো হয়েছে এমন দাবী করা চলে না।

এখানে কেউ বলতে পারেন কোনো পরমপিতা বা ঐশীসত্তা নিরপেক্ষভাবে পরসেবার আদর্শকে যে বিকশিত করা যায় বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনই তার নিদর্শন হতে পারে। কিন্তু এই সাফাই খুব একটা জোরালো নয়। কারণ নিরীশ্বরবাদী হলেও, বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে স্ব স্ব আদর্শ রয়েছে। নির্বাণ বা মুক্তির বাসনা তাদের সকল নৈতিক কর্মের মূল প্রেরণা। বহুজনের হিতে, বহুজনের সুখে আত্মনিবেদন না করলে যে চিত্ত শুদ্ধ হতে পারে না বা নির্বাণের পথ প্রশস্ত হতে পারে না, তা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ব্রহ্মবিহারের আদর্শ প্রচার করেছিলেন তথাগত। পুদ্গলের বন্ধন থেকে জীব নিজেকে মুক্ত করতে পারে নৈতিক কর্মের অনুশীলন দ্বারা— এই বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে জৈনের ত্রিরত্ন অনুসরণ এবং মহাব্রতের উৎযাপনে। কর্তব্যের লঙ্ঘন জনিত যন্ত্রণার উপশম দিয়েই হয়তো মিল

[৬] Isha Upanishad, *The Complete Works of Sri Aurobindo* (*Vol-17*), Sri Aurobindo, p. 150.

ত্যাগাত্মক কর্মের ব্যাখ্যা দিতে চাইবেন। কিন্তু একটি আদর্শকে সামনে না রাখলে শুধু 'intelligent self-interest' দিয়ে এর ব্যাখ্যা হতে পারে না। শুধুমাত্র যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন রেখে অপরের জন্য আত্মত্যাগের মহতী বাসনা কতখানি উৎসাহ পেতে পারে বা আদৌ পারে কিনা তা সংশয়ের।

ঠিক এই কারণেই হিতবাদী ধ্রুপদী ভারতীয় ঐতিহ্যে আস্থা রেখেছেন সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকরা। তাঁরা নৈতিক জীবন যাপনকে কোন না কোন আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেছেন, যে আদর্শের সঙ্গে যুক্তির যোগ থাকলেও তা নেহাতই আকস্মিক, আবশ্যিক নয়। আদর্শ বিষয়ে তাঁরা যে সকলেই একমত তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এই আদর্শ হল কৃষ্ণ চরিত্র, যার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম নিরতিশয় লাভ করেছে। ওই পরম পরাকাষ্ঠাকে সামনে রেখেই মানুষ পারে তার ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যেতে। রবীন্দ্রনাথের কাছে নৈতিক উত্তরণের ওই আদর্শ আসলে সেই মহামানব, যাকে তিনি বিশ্বমানব নামে অভিহিত করেছেন। ওই বিশ্বমানব হওয়ার লক্ষ্যে এবং আপনার মধ্যে নিহিত বিশ্বজনীনতাকে প্রস্ফুটিত করার বাসনাতেই সে 'বিশ্বকর্মা' হয়ে উঠতে চায়।

অদ্বৈত বেদান্তী বিবেকানন্দের কাছে সকল কিছুই এক অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ। আপনার মধ্যে সুপ্ত ওই ব্রহ্মভাব প্রকাশিত করার বাসনাই মানুষকে ত্যাগাত্মক কর্মে প্রণোদিত করে। কোনো যুক্তি দিয়ে যে এর ব্যাখ্যা হয় না, সেকথা তাঁর উক্তিতেই স্পষ্ট— "আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সর্ববিধ মনোভাব, মনুষ্য-স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও ভাল, সে-সবই যুক্তিরাজ্যের বাহির হইতে যে উত্তর আসে, তাহা দ্বারা গঠিত হয়। ... জীবন যদি

শুধু একটি নাটিকা হয়, ...তাহা হইলে অপরের উপকার কেন করিব?"[৭] তবে যুক্তির সারবত্তা যে স্বামীজী অস্বীকার করেন তা নয়। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটা পর্যায়ে এসে মানুষকে যুক্তির সীমা ছাড়াতেই হয়। সেই বিশ্বাস ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন— "... যুক্তি যখন আর চলবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ দেখাইয়া দিবে।"[৮]

পূর্ণাদ্বৈতবাদী শ্রীঅরবিন্দের ভাবনাতেও যুক্তির এই সীমাবদ্ধতার দিকটি প্রকটিত হয়েছে। তাঁর কাছে আদর্শ জীবন হল মানুষ স্বরূপত যে দিব্যত্বের অধিকারী সেই দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দের মতে, "...শ্রেষ্ঠ প্রেম ও পরোপকারও আত্মার দ্বারা সীমিত। পরোপকারের অর্থ অপরের কাছে আমাদের আত্মাকে বলিদান নয়, ইহার অর্থ আমাদের প্রকৃত আত্মার কাছে আমাদের মিথ্যা আত্মার বলিদান...।"[৯]

গান্ধীজীর দর্শনে সত্যকে ঈশ্বর হিসাবে মান্যতা দিয়ে তাকেই আদর্শ বলে গণ্য করা হয়েছে। সেই সত্যভূমিতে আরোহণের পথ হল অহিংসা। এই অহিংসা শুধু হিংসা নিবৃত্তি নয়, পরন্তু প্রেমের দৃষ্টিতে শত্রু ও মিত্র সকলকেই বিবেচনা করা। এই সত্যের পথে যিনি পথিক হবেন সেই সত্যাগ্রাহীকে তাই যেকোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অপরের জন্য ত্যাগ তাই তার কাছে একান্ত স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানী রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী অভিব্যক্তির নিয়মকে অস্বীকার করেন না, সেই নিয়মই বলে— "এক জীবের জীবন নষ্ট না করিলে অন্য জীবের রক্ষা হয় না; একের

---

[৭] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২১৪।

[৮] তদেব,পৃ. ২১৬।

[৯] ঈশাবাস্য উপনিষদ, *উপনিষদাবলী*, শ্রীঅরবিন্দ, পৃ. ৫৫৭।

যাহাতে সুখ, অন্যের তাহাতে দুঃখ; অপরকে দুঃখ না দিলে নিজের সুখ নাই।"[১০] কিন্তু তিনি এও মানেন যে, মানুষের স্বরূপই এমন যে অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার না করে সে পারে না। মাতা যেমন আপন রক্ত ধ্বংস করে আত্মজর বার-বৃদ্ধি ঘটান, তেমনি মানুষও সহজ প্রবৃত্তি বশেই আত্মত্যাগ করে। মূলে সবকিছুই যে এক, একের দ্বিধা বিভাজনের মধ্যেই যে 'তুমি', 'আমি'র ব্যবধান তৈরি হয়, সেই মতে বিশ্বাস করেন তিনি। তিনি এও বিশ্বাস করেন, এক থেকে অভিব্যক্তির নিয়মে যেহেতু বহুর উৎপত্তি, তাই পরের জন্য কর্ম করার একটি প্রবণতা মানুষের মধ্যে থাকতে বাধ্য।

আদর্শের প্রশ্নে এই সমকালীন চিন্তকরা যেমন একমত হতে পারেননি, তেমনি আদর্শের পথে অগ্রসর হওয়ার পন্থা বিষয়েও তাঁদের মতের মধ্যে সাজাত্য নেই। কেউ কর্ম প্রধান পথের পথিক, কারও পথে ভক্তির প্রাবল্য, কেউ আবার জ্ঞানকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এই তিনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু জ্ঞানের পরিচয় যে কর্মে, ভক্তি যে ভক্তকে সমত্ব বুদ্ধি দেয়, কর্মের পরাকাষ্ঠা যে ত্যাগ— এই বিষয়গুলি তাঁদের রচনায় বাগ্ময় হয়ে উঠেছে। এভাবেই পরম আদর্শ ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের সঙ্গে জীবনাচারের এক নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন এঁরা। লোকহিত বা পরার্থ প্রবৃত্তি সেই আধ্যাত্মিক যাত্রারই প্রতিসঙ্গী।

[১০] ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, *রামেন্দ্র-রচনাবলী* (*দ্বিতীয় খণ্ড*), রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, পৃ. ৪৪।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ:

গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রদর্শন,* কলিকাতা, সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *বাঙ্গালির রাষ্ট্রচিন্তা (রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ)*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, *গান্ধী-রচনাসম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত (অনু.), কলকাতা, গান্ধী বিচার পর্ষদ, ১৯৬০।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, *গান্ধী-রচনাসম্ভার (তৃতীয় খণ্ড)*, শান্তিকুমার মিত্র (সম্পা.), কলকাতা, গান্ধী বিচার পর্ষদ, ১৯৬০।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, *গান্ধী-রচনাসম্ভার (পঞ্চম খণ্ড)*, সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি (সম্পা.), কলকাতা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৭০।

গুহ, ডঃ ফুলরেণু, *বাঙ্গালির সমাজচিন্তা (রাজা রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ)*, কলিকাতা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩।

গুহ, শ্রী বিভুরঞ্জন, *নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, কলকাতা, নলেজ হোম, ১৯৬৩।

গোস্বামী, গোপীনাথ, *চাণক্য শ্লোক ও নীতিকথা*, ঢাকা, আকাশ, ২০১৮।

ঘোষ, জগদীশ, *শ্রীগীতা,* কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৫৮।

ঘোষ, শ্রীঅনিলচন্দ্র, *বাংলার ঋষি*, কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, অপালা, *নৈতিকতার অধিবিদ্যার মূলসূত্রের আলোচনা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৬।

চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, *সায়ণ মাধাবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড),* কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, সোমনাথ, *নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৬।

চক্রবর্ত্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র, *স্বামি শিষ্য সংবাদ (পূর্ব্ব কাণ্ড),* কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *কমলাকান্তের দপ্তর (ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত),* শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী (সম্পা.), কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্ম্মতত্ত্ব,* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮৮৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বিষবৃক্ষ,* কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৬৫।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *সীতারাম,* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, *মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা (চতুর্থ খণ্ড),* আমেদাবাদ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০।

চ্যাটার্জী, অমিতা, *ভারতীয় ধর্মনীতি,* কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৬৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কাহিনী,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান, শংকর সেনগুপ্ত (অনুঃ), কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *প্রভাত সংগীত*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৮৮৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মানুষের ধর্ম*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রক্তকরবী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (একাদশ খণ্ড)*, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯১১ শকাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাধনা*, সুলীন রায় (অনু.), কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খণ্ড), কলিকাতা, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *কর্ম্মকথা*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *রামেন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *রামেন্দ্র-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *বিবিধ-কাব্য*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ, *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, কলিকাতা, শ্রীভারতী প্রেস, ১৩৪৭ সন।

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, *মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।

নন্দী, সুধীর কুমার, *নীতিবিদ্যা*, কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৬২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশকুমার, *গান্ধী পরিক্রমা*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণ্ময়, *উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণ্ময়, *উপনিষদের দর্শন*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়. *রবীন্দ্র-দর্শন*, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

বেদব্যাস, *মহাভারত (শান্তি পর্ব)*, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় (প্রকাশক), কলিকাতা, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, কালিদাস, *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।

মনু, *বৃহৎ মনুসংহিতা (মেধাতিথির ভাষ্য ও কুল্লূকভট্টের টীকা)*, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ, *ভগবান শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা (চতুর্থ সংস্করণ)*, কলিকাতা, বসুমতী প্রেস, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

রায়, কৃষ্ণা, *রবীন্দ্র মননের কয়েকটি ধারা*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব ক্যালচার, ২০১২।

শ্রীঅরবিন্দ, *উপনিষদাবলী*, শ্রী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়(অনু.), কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৫৭।

শ্রীঅরবিন্দ, *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি*, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু (অনু.), কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৫৯।

সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, স্বামী অমৃতত্বানন্দ (অনু.), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২২।

সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, *তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, ২০১৩।

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *মহামানব বুদ্ধ*, অভিজিৎ ভট্টাচার্য (অনু.), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৩।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী(তৃতীয় ভাগ)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী(দ্বিতীয় ভাগ)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী(প্রথম ভাগ)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

স্বামী জগদানন্দ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (দশম খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা* (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের, বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ (প্রথম ভাগ)*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

Aristotle, *The Nicomachean Ethics (*5th ed*)*, F.N. Peters (Trans), London, Kegan Paul Trenoh Trubner & Co. Ltd., 1893.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. Wilfrid Harrison (ed), Oxford, Basil Blackwell, 1960.

Bhattacharyya, P.N, *A Text Book of Psychology (Part-I)*, Calcutta, A. Mukherjee & Co. Pvt. Ltd., 1986.

Copleston, F, *A History of Philosophy (Vol-I)*, New York, Image Books, 1993.

Frankena, William K, *Ethics*, Noida, Pearson India Education Service Pvt. Ltd. 2015.

Gandhi, M.K., *Sarvodaya*, Bharatan Kumarappa (ed), Ahmedabad, Navajivan Piblishing House, 1954.

Guilford, J.P, *General Psychology (2nd ed)*, New York, D. Van Nostrand Company, 1952

Hick, John H, *Philosophy of Religion*, United States of America, Prentice Hall Inc., 1990.

Kant, Immanuel, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals*, Thomas K. Abbott (Trans), New York, The Bobbs Merrill Company Inc., 1949.

Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, New Delhi, Allied Publishers Private Ltd., 1967.

Mackenzie, John S, *A Manual of Ethics*, New York City, Hinds & Noble Publishers, 1901.

Mackenzie, John S, *Hindu Ethics (A Historical and Critical Essay)*, London, Oxford University Press, 1922.

Mill, Jhon Stuart, *Utilitarianism*, Roger Crisp (ed), New York, Oxford University Press, 2011.

Mitra, Susil Kumar, *The Ethics of the Hindus*, Calcutta, University of Calcutta, 1963.

Plato, *The Republic of Plato*, Tichenor, H. M. (ed), Girard, Haldeman Julius Company, 1922.

Ranganathan, Shyam, *Ethics and the History of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 2007.

Sharma, I. C., *Ethical Philosophy of India*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1965.

Sidgwick, Henry, *The Methods of Ethics (7th ed)*, London, Macmillian & Co Ltd., 1963

Sinha, Jadunath, *The Foundation of Hinduism*, Varanasi, Pilgrims Publishing, 2007.

Sri Aurobindo, *Isha Upanishad*, The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-17), Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram Trust, 2003.

Sri Aurobindo, *The Human Cycle*. The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-25), Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram, 1997.

Stace, W. T., *A Critical History of Greek Philosophy*, London, Macmillan and Co. Ltd., 1920

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-I), Kolkata, Advaita Ashrama, 2010.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-II), Kolkata, Advaita Ashrama, 2011.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-III), Kolkata, Advaita Ashrama, 2011.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-IV), Kolkata, Advaita Ashrama, 2009.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-VI), Kolkata, Advaita Ashrama, 2011.

Tagore, Rabindranath, *Religion of Man*. London, George Allen & Unwin Ltd., 1922.

Tagore, Rabindranath, *Sādhanā -The Realisation of Life*, New York, Macmillan Company, 1915.

Thilly, Frank, *Introduction to Ethics*, New York, Charles Scribner's Sons, 1912.

Tiwari, Kedar Nath, *Classical Indian Ethical Thought*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.,1998.

Varma, Vishwanath Prasad, *The Political Philosophy of Sri Aurobind*o. Delhi, Motilal Banarsidass, 1960.

Yajnavalkya, *Yajnavalkya Samhita (vyavaharadhyaya)*, Kumudranjan Ray (ed), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 1946.